অতুলপ্রসাদ সেনের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

অতুলপ্রসাদ সেনের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

শোভন সোম
-সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) উনিশ ও কুড়ি শতকের মধ্যবর্তী পরিবৃত্তিকালের কবি। সেই পরিবৃত্তিকালের যাবতীয় লক্ষণ যেমন তাঁর কাব্য-রচনায় সমূহ বর্তমান, সেইসঙ্গে তাঁর আটপৌরে প্রায় মুখের ভাষার মতো সহজ সাবলীল ও অকপট একটি বাগ্‌ভঙ্গিতেও তিনি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে আছেন।

মুদ্রণপূর্ব বাংলাসাহিত্য স্বাভাবিকভাবেই ছিল কাব্য এবং ছিল গেয় বাক্। পাঁচালি থেকে সুর-তাল সমৃদ্ধ গেয় বাক্ শ্রুতি ও স্মৃতিতে ধারণের সহায়ক বলেই যাবতীয় সাহিত্য বিশেষ ছন্দে ও সুরে বাঁধা হত। চর্যাপদ থেকে উনিশ শতকের উষাকাল অবধি, মুদ্রিত-অক্ষরে কাব্যগ্রন্থ-প্রকাশের পূর্ব অবধি, বাংলাসাহিত্য ছিল গেয় বাক্ এবং মুদ্রণ-পূর্ব গদ্যের নিদর্শন দেখাতে আমাদের দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রের শরণ নিতে হয়। মুদ্রণ যুগে প্রবেশের পর উনিশ শতকেও বাগ্‌গেয়কার পরম্পরায় অনেক কবি এসেছেন এবং দীর্ঘকাল গীতিকাব্য বলতে গেয় বাক্ই বুঝিয়েছে, কাব্য ও গানের মধ্যবর্তী সীমারেখা অনেকেই মানেননি। এই পরিবৃত্তির লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, যা পাঠযোগ্য রচনা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে, তারও শিরোদেশে রাগ তালের উল্লেখ লক্ষ্য করা গিয়েছে। 'কল্পনা' থেকে 'মহুয়া' নানা কাব্যগ্রন্থে এই কাব্য ও গানের মধ্যবর্তী অবস্থান তাঁর রচনায় দেখা গেছে। সুর-সহযোগে গাইবার জন্য বহু কবিতাতেও তিনি কায়িক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন—যাতে সুরে-তালে ও ছন্দে তা পরিবহ হয়। 'গীতাঞ্জলি'র অধিকাংশ কবিতাই সুরারোপিত হয়েছে এবং সুরারোপিত হয়নি এমন কবিতায়ও ধ্রুপদের চার তুকি আঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। 'গীতাঞ্জলি'কে গানের বই বলা হয় না, বলা হয়, কাব্যগ্রন্থ; যদিও ওই 'গীতাঞ্জলি' নামের মধ্যেই গীত-শব্দটি উদ্দেশ্যসাধক শব্দ-হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে।

এই দোলাচল ও অনির্দিষ্ট অবস্থান অতুলপ্রসাদের কাব্যরচনায় নেই। মাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তিনি তাঁর যাবতীয় কাব্যরচনায় সুর সংযোজন করেছিলেন এবং নিজের বাগ্‌গেয়কারক অবস্থানটি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয় যে, এই কারণে তাঁকে গীতিকার বলতে হবে। তিনি কাব্যই রচনা করেছিলেন, যে-কাব্য ছিল গেয় বাক্। তাঁর কাব্যরচনা একই সঙ্গে পাঠযোগ্য; সুর সেই কাব্যের অন্তর্লীন ভাবটির সম্পূরণ করে এবং রসের জাগরণ ঘটাতে সহায়তা করে।

গীতিকার-শব্দটি বিশ-শতকের চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ সাল নাগাদ বাংলাভাষার শব্দসম্ভারে অনুপ্রবেশ করেছে নিতান্ত বাণিজ্যিক কারণে। বাগ্‌গেয়কারক তিনিই যাঁর রচিত বাক্ গেয় এবং সেই গেয় বাক্যের সুরটিও তাঁর রচিত, এবং যে গেয় বাক্ তাঁরই কণ্ঠে সর্বপ্রথম শোনা গিয়েছে। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল

রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এবং আংশিকভাবে কাজী নজরুল ইসলাম বাগগেয়কারক। তাঁদের বাণীতে অপরের দ্বারা সুর সংযোজিত হয়নি কিংবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বিশেষভাবে গাইবার জন্যে তা রচিত হয়নি। গীতিকার তিনিই যিনি কেবল গানটিই রচনা করেন সুর-সংযোজনের জন্যে। সুর-সংযোজন করেন অপরজন। গানটি প্রথম শোনা যায় গায়কের কণ্ঠে, যিনি গীতিকার নন, সুরকার নন। কুড়ি শতকের এই বিশেষায়ণ এবং কর্মবিভাজনের ব্যাপারটি উনিশ শতক অবধি অজানা ও অপ্রচলিত ছিল; গেযবাকের সুর-সংযোজনের দায় ছিল বাক্-রচনাকারেরই। গেয় কাব্য ছিল এক কম্পোজিট ইউনিট বা সংযুক্ত-সত্ত্ব একক—যার মধ্যে অপরের হস্তক্ষেপ ছিল অবাঞ্ছিত। উনিশ শতকের জাতক অতুলপ্রসাদ এই পরম্পরা কুড়ি শতকে বহন করে এনেছিলেন। অতুলপ্রসাদের গান তাঁরই মুখে প্রথম শোনা যেত, যা ছিল স্বাভাবিক। অধিকন্তু, তাঁর গাওয়া তাঁরই দুটি কাব্যগীতি "মিছে তুই ভাবিস মন", "জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানি" হিন্দুস্থান কোম্পানির চণ্ডীচরণ সাহার দূরদর্শিতায় আমরা ধ্বনিমুদ্রিকায় শুনেছি।

পরিবৃত্তিকালের আরও একটি লক্ষণ তাঁর মধ্যে আমরা দেখতে পাই। রামনিধি গুপ্ত আঠারো শতকে টপ্পার আঙ্গিককে তাঁর গেয় বাকের প্রধান আঙ্গিক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল ধ্রুপদে। ধ্রুপদের তুক-বিন্যাস তিনি গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খেয়ালের আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। অতুলপ্রসাদ লখনউয়ি ঠুংরির আঙ্গিক, কাজরি, সাওন-ইত্যাদি অবধ অঞ্চলের গীতাবয়ব বাংলায় এনেছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা অন্য আঙ্গিকে গান বাঁধেননি। রবীন্দ্রনাথ বাউলের অসাধারণ প্রয়োগ করেছিলেন, "আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে" গানে। দ্বিজেন্দ্রলাল কীর্তনের অত্যুজ্জ্বল প্রয়োগ করেছিলেন, "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়" গানে। ঠুংরির বেদনাতুর মিঠাস্ অতুলপ্রসাদের গানে প্রাধান্য পেলেও বাংলার বাউল ও কীর্তনের আশ্চর্য সংশ্লেষ আমরা তাঁর "আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে বঁধু আমার" গানে পাই। বাগগেয়কারক কবিরা তাঁদের গেয় বাকের জন্যে গানের এক-একটি বিশেষ কাঠামোর প্রতি অনুরক্ত হলেও অন্যান্য আঙ্গিকের ব্যবহারেও নৈপুণ্য দেখাতেন।

আলিবর্দি-সিরাজউদ্দৌলার দরবারের ভাষা বাঙালির ভাষা ছিল না। বাংলার সেই "শেষ স্বাধীন সম্রাট" বলে যে বিস্তর নাটুকেপনা এককালে হয়েছে, তাঁর দরবারের ভাষা ছিল ফারসি—কারণ, বংশানুক্রমে সেই "বাঙালি" সম্রাট ছিলেন বহিরাগত। আঠারোশো তেইশ অবধি এ দেশের আদালতের ও সহবতের ভাষা ছিল ফারসি। সেই পরম্পরায় রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ, মায় অতুলপ্রসাদ সেনের পিতা ছিলেন ফারসিতে দুরস্ত। রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ যে পোষাকে পরিচিত সেটাও ছিল ফারসি উত্তরাধিকারের পোষাক। বঙ্গচেতনা, বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগ ঠিক কবে থেকে বাঙালির মধ্যে দেখা গিয়েছে, কবে থেকে বাঙালি তার ভাষিক সত্তার গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করতে শুরু করেছে, তা সন্ধান-সাপেক্ষ। আঠারো শতকে রামনিধি গুপ্ত গান বেঁধেছিলেন "নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশিভাষা মিটে কি আশা।" তিনি স্বদেশিভাষা বললেও বঙ্গবাণী শব্দ উচ্চারণ করেননি।

আঠারো শতকেরই সন্দ্বীপের কবি আবদুল হাকিম সানুরাগে বলেছিলেন, "যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবানী/সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি/মাতাপিতামহক্রমে বঙ্গেতে বসতি/দেশি ভাষা উপদেশ মান হিত অতি/দেশিভাষা বিদ্যা ঘরে মনে না জুড়ায়/নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায়।" সেই পরম্পরাতেই কুড়ি শতকে অতুলপ্রসাদ লিখেছিলেন, "মোদের গরব মোদের আশা/আ মরি বাংলাভাষা।" আবদুল হাকিম যেমন নির্দ্বিধভাবে 'বঙ্গবাণী' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, অতুলপ্রসাদও তেমনি 'বাংলাভাষা' শব্দ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন। সংস্কৃতি-নির্মাণের এই প্রবহমানতা, জাতি হিসেবে বাঙালির চেতনার বিস্তার আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের একটি প্রধান লক্ষণ ছিল। কখনও কারও রচনায় 'বঙ্গজননী' ও 'ভারতমাতা' একীকৃত হয়ে গেলেও, 'বঙ্গবাণী' ও 'বাংলাভাষার' মতো অ্যামফেটিক বা সোচ্চার শব্দে বাঙালির স্বাতন্ত্র্যই ঘোষিত হয়েছে। আগরা অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ বা ইউনাইটেড প্রভিন্সেস অব আগরা অ্যান্ড আউধের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা দিলেও অতুলপ্রসাদের বাঙালি সত্তা চিরজাগরুক ছিল। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের সংগঠন ও কাশী থেকে 'উত্তরা' নামক বাংলা মাসিকের প্রকাশের তৎপরতায় তাঁর সেই বাঙালিয়ানাই আমরা প্রত্যক্ষ করি।

বঙ্গচেতনা, বাংলাভাষার কারণে গৌরববোধ, ভারতধারণা, স্বাজাত্যভাবনা-ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের ধারণা। কালিদাস আসমুদ্র হিমাচলের কথা দেশচেতনার বা জাতিগঠনের প্রসঙ্গে বলেননি। তাঁর সময়ে "একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" বা এক অখণ্ড রাষ্ট্রভাবনা ছিল না। উপনিবেশবাদের হাত ধরে ভাষা ও দেশের সীমার মধ্যে এই ধরনের চেতনা বৈশ্বিক হয়ে ওঠে। ভাষা ও দেশ জাতিগঠনের উপাদান হয়ে ওঠে। এই ধারণাকে ঘিরে কবিদের আবেগ উথলে-উপচে পড়ে। পরাধীন দেশে স্বাধীন দেশে এই আবেগ সমভাবেই লক্ষ্য করা যায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান/তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান/দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান/ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়", ·ঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" থেকে অতুলপ্রসাদের "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে", "নয় তুরস্ক, নয়কো তাতার/জন্মমৃত্যু এই যে ঠাঁই"—সেই বৈশ্বিক ভারতবঙ্গেরই অভিঘাত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত সেন-প্রমুখ সে-সময়ের বরিষ্ঠ সকল কবি এই ভাবনায় দোলায়িত হয়েছিলেন। কুড়ি শতকে জীবনানন্দ দাশও লিখেছিলেন, "তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে/রয়ে যাব।' এহেন উক্তিকে জীবনানন্দের নিছক দেশপ্রেম বলা যাবে না। আঠারো শতকের মধ্যাহ্ন থেকে গোটা উনিশ শতক জুড়ে, এমনকি কুড়ি শতকেব শুরুতেও এই রোমান্টিক বৈশ্বিক হাওয়া বয়েছিল। এই সকল কবিদের অনেকেই রাজভক্ত ছিলেন। পরাধীন দেশের কবি ছিলেন বলেই এঁদের এইসব কবিতাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কবিতা বলা যাবে না। আপন ভাষা ও দেশের জন্যে গর্ব তখন জাতীয় ভাবৈক্যের অভিব্যক্তিই ছিল। এই রোমান্টিক বৈশ্বিক হাওয়ায় উপনিবেশবাদী দেশের কবি ওর্ডস্‌ওঅর্থ লিখেছিলেন, "'Tis past the melancholy dream!/ Nor will I quit thy shore/A second time; for still I seem to love thee

more and more."। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যেও আশার ছলনের সম্মোহনের শেষে দেশ ও মাতৃভাষাকে ঘিরে এমনই আবেগ উন্মথিত হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। কুড়ি শতকের মধ্যাহ্নে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনো কবি যখন এ দেশে জন্মানোর জন্যে আত্মধিক্কার দিয়ে পৃথিবীকে সেলাম ঠোকেন তখন অতুলপ্রসাদের মতো কবিদের অস্তিবাদ আমাদের আশ্বস্ত করে। তাঁর প্রেমের কবিতায়ও আমরা বেদনা পাই, বিলাপ পাই না, এবং বেদনাতে যে তিনি হতাশ হন তা-ও নয়। একটি আশার রেশ তাঁর রচনায় থেকে যায়।

দেশচেতনা, ভাষাচেতনার সঙ্গে উনিশ শতকের জাতক কবিরা গ্রিক ভাস্করদের মতো আদর্শ মানুষের এক প্রতিমাও কল্পনা করেছিলেন। এই আদর্শবাদ ছিল কালের ধর্ম ও পরিবৃত্তির লক্ষণ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যে এর ভূরিভূরি নিদর্শন আছে। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'রাখিমন্ত্র', কামিনী রায়ের 'সুখ' কবিতায়, কুসুমকুমারী দাসের 'আদর্শ ছেলে' কবিতায় এই প্রবণতা বিস্তৃততর হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন মানুষ কবিতার দ্বারস্থ হত আদর্শবাদেরই কারণে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির" কবিতায় সেই আদর্শের নির্মাণ করেছিলেন। স্বাজাত্যবোধের নবীন উন্মেষে সাহিত্যে-কাব্যে-চিত্রকলায় জাতীয় আদর্শের সর্বাধিক নির্মাণ আমাদের আধুনিক মননের পরিচয় দেয়। এই পরিস্থিতিতে অতুলপ্রসাদের "সবারে বাসরে ভালো", "হও ধরমেতে বীর", "মিছে তুই ভাবিস মন"—ইত্যাদি ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত। চিত্তরঞ্জন দাশ, অতুলপ্রসাদ সেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি করলেও তাঁদের এই-ধরনের কাব্য-রচনা কোনো রাজনীতির রঙে রঞ্জিত ছিল না। বরং অতুলপ্রসাদ ছিলেন অত্যন্ত নিম্নস্বর কবি। এমন জাঁকজমকহীন শব্দালঙ্কারশূন্য নিম্নস্বর ব্যতিক্রমী বলেই বোধহয় আপনি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। পাঠযোগ্য কাব্যে যে-সকল শব্দ অনায়াসে চলে, গেয় কাব্যে তা সবসময় চলে না। এই সচেতনতা অতুলপ্রসাদের কাব্যে লক্ষণীয়। এমনকি ছন্দ-মাত্রা-আঙ্গিক নিয়েও কোনো পরীক্ষা তাঁর রচনায় নেই।

মুদ্রণ-ব্যবস্থার সুযোগে কবিতা আর স্মৃতিশ্রুতিবাহিত মাধ্যম থাকেনি। ছাপার অক্ষরে তা গ্রন্থিত হওয়ার ফলে স্মৃতিশ্রুতিজনিত বিকৃতির সম্ভাবনা থেকে কবিতা মুক্ত হল। এই অবস্থায় ইংরেজি কবিতার প্রেরণায় কবিতাকে সুর থেকে বিযুক্ত করে পাঠযোগ্য করবার চেষ্টাও হল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পয়ারের চাক ভাঙলেন না, কিন্তু এক-একটি পংক্তির পরিসরে এক-একটি বাক্যকে শেষ করে দিলেন না; তিনি গদ্যের মতো একটি পংক্তিকে দু-আড়াই তিন-সাড়ে তিন পংক্তিতে ঢেলে গদ্যোপম পাঠে রূপান্তরিত করলেন। তাঁকে অনেকেই অনুসরণ করেছেন। এভাবে কবিতা সুরবহবাণীর পরিচয় মুছে এক স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় লাভ করে। এরই সমান্তরালে গীতিকাব্যের একটি ধারাও চলেছিল। মাইকেল মধুসূদনের প্রেরণায় মহাকাব্যিক ছাঁচ অনেকে ব্যবহার করেছিলেন। এই দুটি ধারার অন্বয়ে পরবর্তীকালের বাংলা কবিতা নবীন রূপ পেয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতা মহাকাব্যিক ছাঁদ থেকেই গদ্যোপম পাঠের পরম্পরা পেয়েছে, আবার গীতিকাব্য থেকে আবয়বিক গঠনটিও নিয়েছে। এভাবে, গদ্যোপম পাঠ এবং রূপের দিক থেকে গীতিকবিতা—এই দুই

প্রবণতা উনিশ শতকের উত্তরাধিকার। অতুলপ্রসাদ গীতিকাব্য লিখেছেন, কিন্তু বাক্‌কে তিনি সুর থেকে বিমুক্ত করেননি। তিনি গীতিকাব্য এবং গেয়কাব্য দুয়েরই পরম্পরা রক্ষা করেছিলেন। কুড়ি শতকেই এই পরম্পরা লুপ্ত হয়েছে। কুড়ি শতকের কোনো কোনো কবির কবিতায় সুর প্রয়োগ করা হলেও তা জনপ্রিয় হয়নি। যে কবিতা পাঠযোগ্য কবিতা হিসেবে আদৃত, সুরের সংযোগে তা আদরণীয় হয়নি। উনিশ শতকের জাতক কবিদের মতোই অতুলপ্রসাদও সংগীতবিদ্যার চর্চা করেছিলেন। মোগল-সংস্কৃতির পরম্পরায় সংগীতচর্চা আভিজাত্যের অন্যতম লক্ষণ ছিল। রামমোহন রায় থেকে অতুলপ্রসাদ পর্যন্ত সেই পরম্পরার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান ছিল। কুড়ি শতকে কাব্য ও সংগীতের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটার পর এবং ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রভাবে কাব্যরচনা ও কাব্য-রসোপভোগে সংগীত-জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই।

উনিশ-শতকের জাতক অনেক কবিই কবিতায় শিরোনাম দিতেন এবং সেই সঙ্গে সুর-তালের নির্দেশও দিতেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। অতুলপ্রসাদের কাব্যগীতিগুলি শিরোনামহীন। 'অর্ঘ্য', 'সাগর-বক্ষে জ্যোৎস্নাসুন্দরী' ও 'প্রত্যাবর্তন' ছাড়া আর-কোনো কাব্য-রচনায় তিনি শিরোনাম দেননি। তিনি তাঁর কাব্যগীতিগুলিকে 'দেবতা', 'প্রকৃতি', 'স্বদেশ', 'মানব' ও 'বিবিধ' পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছিলেন। বস্তুত, তাঁর কাব্যরচনাকে এই-সকল পর্যায়ের সীমার মধ্যে সব সময় দেখা যায় না। এই সকল পর্যায়ের মধ্যবর্তী সীমারেখা বারবার মুছে যায় ও তাঁর রচনার লক্ষ্য বিস্তৃততর হয়। 'মানব'-পর্যায়ের কাব্যগীতিতে দয়িতার বা প্রেমপাত্রীর প্রতিমা সামনে উঠে আসে এবং গান সেই দয়িতার উদ্দেশ্যে কথন হয়ে গিয়েছে। "ওগো নিঠুর দরদি, এ কি খেলছ অনুক্ষণ/তোমার কাঁটায় ভরা বন, তোমার প্রেমে ভরা মন", "সে ডাকে আমারে/বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে", "এসো গো একা ঘরে একার সাথি/সজল নয়নে বল রব কত রাতি", "আমার পরাণ কোথা যায় উড়ে/কে যেন ডাকিছে মোরে দূর সাগর পারে/বিরহবিধুর সুরে", "আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে/বঁধু আমার"-ইত্যাদি-'দেবতা' পর্যায়ভুক্ত রচনায় 'দেবতা' যে লক্ষ্য নন, এই কথা ওই রচনায় প্রবেশমাত্র বোঝা যায়। নিজের ব্যক্তিগত দুঃখকে তিনি ছদ্মবেশ পরিয়ে আড়াল করতে পারেননি। দেবতার উদ্দেশে বলা কথা দয়িতার উদ্দেশে বারবার চলে গিয়েছে। কোথাও 'হরি', 'বঁধু', 'বন্ধু', 'নাথ', 'দীনবন্ধু', 'প্রভু'-ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলেও এগুলির লক্ষ্য যে দেবতা নয়, তা গোপন থাকেনি। তিনি যখন বলেন "ওগো নিঠুর দরদি/...তোমার সাথে আছে আমার অনেক কথন", তখন স্পষ্টই বোঝা যায়, এই সকল রচনা বন্দন নয়, এই সকল রচনা তাঁর অন্তরের কথন বহন করছে। তাঁর জীবনীর সঙ্গে এই রচনাগুলিকে মিলিয়ে পড়লে তা আরও স্পষ্ট হয়। 'প্রকৃতি'-পর্যায়ের গানে বাহ্য-প্রকৃতিতে তাঁর অন্তরেরই প্রক্ষেপণ ঘটেছে। "ওরে বন তোর বিজনে সংগোপনে কোন্ উদাসি থাকে/আমার মনের বনের উদাসিরে ডাকে সে আজ ডাকে", "আকাশ বল রে আমায় বল, আমার আঁখিজল/তাদের মতো জীবনখানি করবে কি শ্যামল—আমায় বল রে/আমি তাদের মতো আমার বঁধুর সনে মধুর খেলা/খেলব কি দিনের শেষে", "কে গো তুমি বিরহিনী আমারে সম্ভাষিলে/এ পোড়া পরান তরে এত

ভাসিলে", "যাবনা যাবনা যাবনা ঘরে/বাহির করেছে পাগল মোরে"-ইত্যাদি প্রকৃতি-বিষয়ক রচনায় কবির অন্তর-প্রকৃতিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'বিবিধ'-পর্যায়ের "আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর/ওগো অনেকদিনের পর", "শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল বাতে/তোরা আয় গো কে ঝুলিবি আয়", "ডাকে কোয়েলা বারে বারে/হা মোর কান্ত কোথা তুমি হা রে", "তুমি কবে আসিবে মোর আঙিনায়/কত বেলি কত চামেলি যায় বৃথা যায়", "বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে/আমিও একাকী তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে", "কে যেন আমারে বারে বারে চায়/আমি তো চিনিনে তারে সে চেনে আমায়", "ওগো দুঃখী কাঁদিছ কি সুখ লাগি/সুখের যাতনা জান না কি", "ঝুমক ঝুমক ঝুমঝুম নূপুর বাজে/বিরহী পরান মম সে দুটি চরণ যাচে"-ইত্যাদি একান্তই তাঁর অন্তরের কথা এবং 'বিবিধ' শিরোনামের নির্লিপ্তি দিয়ে সেই অন্তরের কথাকে আবৃত করা যায় না। এইখানেও তিনি রোমান্টিক গীতিকাব্যের কবি।

একদিকে সংস্কৃতিনির্মাণ এবং তারই সমান্তরালে ব্যক্তিগত কথন তাঁর কবিতায় দ্বিধা সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতি-নির্মাণে তিনি যতই বর্হিমুখী, ব্যক্তিগত কথায় তিনি ততই অর্ন্তমুখী। এই দুয়ের টানাপোড়েনে তাঁর রচনা বোনা হয়েছে।

সকল সৃষ্টিই প্রাথমিকভাবে স্বকালের। স্বকালের ঘাত-অভিঘাত, স্থিতি-পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া মানুষের সৃষ্টিতে সঞ্চিত হয়। অতুলপ্রসাদ তার ব্যতিক্রম নন। উনিশ শতক থেকে কুড়ি শতকের পরিবৃত্তিকাল তাঁর রচনায় গ্রন্থিত রয়েছে। সকল সৃষ্টির মধ্যে কিছু সৃষ্টি কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। তখন পরবর্তীকালের মানুষ ওর মধ্যে নিজেকেই পায়। এই সকল সৃষ্টির গায়ে তখন বয়সের জীর্ণতার ছাপ পড়ে না। অতুলপ্রসাদ তাঁর সময়েও যত-না পঠিত ছিলেন, তার চেয়ে বেশি তাঁর রচনা গাওয়া হত। সুরকে বাদ দিয়ে তাঁর কাব্যগীতিকে ভাবা যায় না। বাগগেয়কার হিসেবেই তিনি বেঁচে আছেন, এ-কথা আংশিক সত্য; কারণ তাঁর কাব্যগীতিতে পরবর্তীকালের মানুষ যদি নিজেদেরই না পেত, তাহলে তিনি গীত হতেন না। তাঁর স্বদেশভাবনার গান আনুষ্ঠানিকভাবে কালেভদ্রে গাওয়া হয়, কিন্তু অহরহ তাঁর 'দেবতা', 'মানব', 'প্রকৃতি' বিষয়ক গান গাওয়া হয়। অতুলপ্রসাদের গীতিকাব্যের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তিনি বহুপ্রজ কবি ছিলেন না। তাঁরও চেয়ে অনেক বেশি কাব্যগীতি লিখেছিলেন কেউ-কেউ। উনিশ শতকের গীত-সংকলনে সেই সকল রচনা সংকলিতও হয়েছিল। তাঁদের কাব্যগীতির কাব্যমূল্যও ন্যূন ছিল না। কিন্তু অঙ্গুলিমেয় বাগগেয়কারক বহুল গীত এবং বাঙালি তাঁদের চেনে। অতুলপ্রসাদের 'দেবতা', 'মানব', 'প্রকৃতি'-বিষয়ক যে-সকল কাব্যগীতি বহুশ্রুত, সেগুলির মধ্যে কালিদাসের যক্ষের মতো একজন প্রেমিকের বিরহবেদনা ও মিলনের আকুতি বাণীরূপবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই বিরহবেদনা ও মিলনাকাঙক্ষার যে আবেদন, সে আবেদন চিরন্তন। এই আবেদনের অতীত নেই। অতুলপ্রসাদ তাঁর হৃদয়-মথিত কথন যে আটপৌরে সহজ শব্দসজ্জায় রেখে গিয়েছেন তা মানুষের মুখেরই ভাষা। তাঁর কাব্যভাষার সঙ্গে মানুষের মুখের ভাষায় ব্যবধান নেই। এই অব্যবধান তাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালের মানুষের সংযোগ সহজতর করেছে। তাঁর একার সকল অনুভূতি

নিখিলের অনুভূতি হয়ে উঠেছে। এ-কারণে অতুলপ্রসাদ বিস্মৃত নন। সুরের আশ্রয়ে তাঁর কাব্যগীতির রস অবশ্যই গভীরতর হয়ে ওঠে। কিন্তু কবিতা-হিসেবে পাঠ করলেও এর আবেদনে কোথাও খামতি মেলে না। তাঁর রচনার অনায়াস ভঙ্গিরও নিজস্ব আবেদন পাঠককে অতি সহজে স্পর্শ করে। এই রচনা কেবল অনায়াস নয়, এই রচনা অত্যন্ত অকপট।

পি। ৩৭ সি.আই.টি রোড — শোভন সোম
কলকাতা ৭০০০১০
১৬ কার্তিক, ১৪০৮

অতুলপ্রসাদ সেন

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্তদ্বারে॥

মৈত্রী তব সমুজ্জ্বল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধা-ঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো;
রসতৈলে জ্বেলেছিল আলো।

দিন পরে গেছে দিন মাস পরে মাস,
তোমা হতে দূরে ছিল আমার আবাস।
"হবে হবে দেখা হবে"
এ কথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত সম্ভাষণে॥

আমারে যাবার কালে এলো কাছে ডাকি
"হবে হবে দেখা হবে" মনে ওই বাকি।
সেখানেও হাসিমুখে
বাহু মেলি লবে বুকে
নব জ্যোতি-দীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে মনে জাগে ॥

এখানে গোপন চোর ধীরে ঢুলায়
করে সে বিষম চুরি পলক ভুলায়।
যদি ছায়াহীন কাল
বিনাশের ফেলে জাল,
বিরহের স্মৃতি লয় হরি'
সব চেয়ে সে ক্ষতিরে ডরি ॥

তাই বলি দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।
অনেক হারাতে হয়
তারেও করি নে ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি
তার বেশি যেন নাহি থাকি ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯ ভাদ্র
১৩৪১
শান্তিনিকেতন

গীতিগুঞ্জ
১৯৩১

১

মিছে তুই ভাবিস মন!

তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, আজীবন!

পাখিরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে ;
নাইবা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।

ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল কি হবে?
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ।

মনদুপ চাপি মনে, হেসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস্ প্রাণের বেদন।

আজি তোর যার বিরহে, নয়নে অশ্রু বহে,
হয়ত তাহার পাবি দেখা গানটি হলে সমাপন।

২

ঝিঁঝিট খাম্বাজ

আমারে ভেঙে ভেঙে কোরো হে তোমার তরী ;
যাতে হয় মনোমত তেমনি করে লও হে গড়ি।

এ তরুতে নাই ফুল-ফল,
শিকড়গুলি বাড়ছে কেবল ;
দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে,
লও হে তারে ছিন্ন করি।

শক্ত তারে করবে বলে
ফেলে রেখো রৌদ্রে-জলে ;
পুড়িয়ে তারে কোরো বাঁকা,
যখন তুমি গড়বে তরী।

যাদের ধন আছে অপার
সোনার নায়ে কোরো হে পার ;
আমার বুকে করিয়ো পার
যাদের নাইকো পারের কড়ি।

তোমার ওই মাঝ-গাঙে
এ তরীটি যদি ভাঙে,
তবে সে অতল তলে
আমায় কুড়িয়ে নিয়ো, হে শ্রীহরি।

৩

বাউল

মন রে আমার! তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়।
হালে যখন আছেন হরি,
(তোর) যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ়।

যখন যুঝবে তরী স্রোতের সনে—মনরে আমার!
(তুই) টানিস আরো পরান-পণে ;

যখন পালে লাগবে হাওয়া,
সময় পাবি রে জিরুবার।

মাঝির সেই গানের তানে—মন রে আমার, মন রে আমার,
চল্‌ সাথির সনে সমান টানে,
চাস না রে তুই আকাশ-পানে,
হোক-না ফরসা, হোক-না আঁধার।

কাজ কী জেনে কোথায় যাবি—মনরে আমার!
কখন ঘাটে নাও ভিড়াবি,
কখন গাঙে লাগবে ভাঁটা,
কখন ছুটে আসবে জোয়ার।

মনে রাখিস নিরবধি—ভোলা মন রে আমার, মন রে আমার
যাঁহারি নাও, তাঁরি নদী ;
যে ফেলবে তোরে বানের মুখে,
সেই তো তরীর কর্ণধার।

৪

বেহাগ

ওহে নীরব! এসো নীরবে। ;
গোপন পরানে মম
গোপনে রবে।
নিশির শিশির-সম,
পশো হে জীবনে মম,
মোরে ফুটাও হে প্রিয়তম,
তব সৌরভে।

তোমারে পাইলে আমি,
কারেও কব না স্বামী,
রব নীরবে দিবস-যামী,
তব গরবে।

৫

বাউল

তোমার ভাবনা ভারলে আমার ভাবনা রবে না,
—আর ভাবনা রবে না।

সবাই যখন বলিবে ভালো,
তখন তোমায় দেখাব মোর মনের কালো,
—আর আমার ভাবনা রবে না।

যখন সবাই করবে তিরস্কার,
তখন বুকে ধরব চেপে তব পুরস্কার,
—আর আমার ভাবনা রবে না।

যদি জীবন-পথে করি শত ভুল,
আমার পায়ে লাগুক কাঁটা, সবার পায়ে ফুল,
—আর আমার ভাবনা রবে না।

হারাই যদি সব ভালোবাসা,
সকল আশা ছেড়ে করব তোমারি আশা,
—আর আমার ভাবনা রবে না।

পড়ব যতই দুঃখে-বিপদে,
ততোই মোরে করবে নত তব শ্রীপদে,
—আর আমার ভাবনা রবে না।

শেষে ডাকবে যখন ঘাটে আয় রে আয়,
তোমার বোঝা করব বোঝাই তোমারি খেয়ায়,
—আর আমার ভাবনা রবে না।

৬

বেহাগ

আমি তোমার ধরব না হাত,
নাথ! তুমি আমায় ধরো।
যারা আমায় টানে পিছে,
তারা আমা হতেও বড়ো।
শক্ত করে ধরো হে নাথ!
শক্ত করে আমায় ধরো।

যদি কভু পালিয়ে আসি,
(তারা) কেমন করে বাজায় বাঁশি,
বাজাও তোমার মোহন বীণা,
আরো মনোহর।
তাদের চেয়েও মধুর সুরে
বাজাও মনোহর।

৭

বাউল

কোথা হে ভবের কাণ্ডারি!
একা আমি জীবন-তরী বাইতে নারি।

ভেবেছিনু নাই-বা এলে,
(ওহে ভবনদীর মাঝি,)
যাব চলে আপন পালে
—অবহেলে।
এখন মাঝ-গাঙেতে টুটল দড়ি, ভাঙা নায়ে উঠল বারি।
(হে কাণ্ডারি! ভাঙা নায়ে উঠল বারি)
(আমি দেখি নাই হে, ভাঙা নায়ে উঠল বারি)
আজি এই বিপদকালে,
(ওহে কাল-খেয়ার মাঝি)
এসো তুমি আমার হালে,
আমার পালে।

তোমার টানের তানে নূতন গানে—আমি শুধু গাইব সারি।
(হে কাণ্ডারি! আমি শুধু গাইব সারি)
(তুমি নাও চালাবে, আমি শুধু গাইব সারি)
(চাহি ঢেউয়ের পানে অভয় প্রাণে গাইব সারি।)

৮

ভৈঁরো

কে হে তুমি সুন্দর—অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

কভু নবীন ভানু-ভালে,
কভু ভূষিত নীরদ-মালে,
কভু বিহগ-কূজিত-কুহক কণ্ঠে
গাহিছ অতি সুন্দর।
কভু নির্মল নীল প্রাতে
কনক-কিরীটি-মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর!

কভু পুষ্পিত নভ-কুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে ;
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন শ্যাম-মুরতি অতি সুন্দর!

৯

ললিত

আহা মরি-মরি! এমন আঁখি কোথা পেলে হরি!

গগনপটে নিত্য নূতন, চিত্র আঁক চিত্তহরণ ;
প্রভাত আসে কতই বরন কতই ধরণ ধরি!
আহা মরি-মরি!

বিহগের পাখায়-পাখায়, বিটপের শাখায়-শাখায়,
এমন শোভা নয়ন-লোভা রচ কেমন করি!
আহা মরি-মরি!

রত্ন পরাও অতুল স্নেহে, বিধু-আঁখি নিশির দেহে,
পরাও নিতি নবীন ছাঁদে মেঘের নীলাম্বরী।
আহা মরি-মরি!

কত কাল হতে তুমি রচেছ এ রঙ্গভূমি,
সৃষ্টি তোমার দৃষ্টি জুড়ায় মোহন বসন পরি।
আহা মরি-মরি!

বলিহারি হে অপরূপ! দেখতে নারো কিছুই কুরূপ,
তোমার দ্বারে আসতে হরি, তাই তো লাজে মরি।

১০

নায়েকী কানাড়া

তব পারে যাব কেমনে, হরি!
দুস্তর জলধি, নাহি তরী।

আছি বসে একা ভব তীরে,
ঘোর তিমির ঘন গগন আছে ঘিরে,
বলো-বলো কেমনে এ নিধি তরি।

আছি আঁধার-পানে শ্রবণ পাতি,
যদি আসে হেথা তরঙ্গ আঘাতি
তব তরী ;
সে আশে ধৈরজ ধরি।

১১

খাম্বাজ

বিফল সুখ-আশে জীবন কি যাবে?
কবে আসিবে হরি! কবে বোঝাবে?

হয়ে আছি পথহারা,
তোমার পাইনে সাড়া,
কবে আসিয়ে তুমি পথ দেখাবে?

আসিয়ে তোমার ভবে
শুধু কি কাঁদিতে হবে?
কবে আসিবে কাছে, নয়ন মুছাবে?

সম্মুখে না দেখি বেলা,
ফুরায়ে আসিছে বেলা,
তোমার পারে ভেলা কবে ভিড়াবে?

যদি সংসারের ঘোরে
আরো ঘুরাইবে মোরে,
মিনতি করি, এসো যবে দিন ফুরাবে।

১২

ভৈরবী

কি আর চাহিব বলো, হে মোর প্রিয়!
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

বলিব না, রেখো সুখে, চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভালো বোঝ তাই করিয়ো ;
—শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

যে পথে চালাবে নিজে   চলিব, চাব না পিছে
আমার ভাবনা, প্রিয়! তুমি ভাবিয়ো,
—শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

(দেখো) সকলে আনিল মালা—ভকতি-চন্দন-থালা,
আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিয়ো!
—আর তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

১৩

বাউল

আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, বুঝতে নারি কিছুই যে গো।

নয়নে নাহি ভাতি, মনে হয় চিররাতি
মনে হয় তুমি আমার চিরসাথী ;
একবার জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি
নয়ন ভরে দেখা দে গো!
(এই রাত-কানারে) নয়ন ভরে দেখা দে গো!

কাঁদায়ে কাঁটার ক্লেশে কঠিন এই পথের শেষে
না জানি নিয়ে যাবে কোন্ বিদেশে!
একবার ভালোবেসে, কাছে এসে
কানে কানে বলে দে গো।
(এ কালারে) কানে-কানে বলে দে গো।

রয়েছিস যদি সাথে, দারুণ এ আঁধার রাতে,
ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে যা হাতে-হাতে।
হস্ত আমার হলেও শিথিল,
তুই আমারে ছাড়িস নে গো!
(তোর পায়ে পড়ি) তুই আমারে ছাড়িস নে গো!

১৪

কিষাণ ভাই! তুমি, কি ফসল ফলাবে এমন মাঠে?
কে বলো কিনিবে তারে ভবের ভরা হাটে?

এ জীবন-জমিন বড়ই উষর,
বরষ-বরষ বরষে তবু ধুলায় ধূসর,
তাই নিরাশ হয়ে বসে আছি মনের মলিন বাটে।

খুব গভীর করে দাও লাঙলের চির,
ঢালো তাহে যত পারো নয়ন-কূপের নীর ;
লাগে লাগুক হলের খোঁচা, চরণ রেখো বাঁটে।

তুমিই জানো, ওহে হলধর!
কী দিয়ে ভরিবে আমার খালি গোলাঘর ;
শেষে করে বোঝাই, ভেবে না পাই, নে যাবে কোন্ ঘাটে!

১৫

কালাংড়া

তোর কাছে আসব, মা গো, শিশুর মতো ;
সব আবরণ ফেলব দূরে, হৃদয় জুড়ে আছে যত।

দৈন্য যে মা, মনের-মাঝে, ঘুচবে না তা মিথ্যা সাজে ;
সব আভরণ করব খালি, দেখবি মা গো, মনের কালি ;
শূন্য যে মোর প্রেমের থালি, —তাই চরণে করব নত।

মারবি মা গো, যতই মোরে, ডাকব আমি ততোই তোরে
ধরব যখন জড়িয়ে হাত, দেখব কেমন করবি আঘাত
তখন মা তুই, পাবি ব্যথা, ব্যথা দিতে অবিরত।

মনের হরষ মনের আশে, বলব সবল শিশুর ভাষে,
সুখের খেলনা হাতে পেয়ে, তোর কাছে মা, যাব ধেয়ে ;
তোর স্নেহাশিস মাথায় লয়ে, ভবের খেলা খেলব যত।

১৬

ভৈরবী

প্রভু, মন নাহি মানে।
ভাবি সদা রব চাহি তব পানে।

মাটির খেলনা যায় যে ফাটি, জানি এ খেলা নয় তো খাঁটি,
তবু কুড়াই ভাঙা মাটি ভাঙা প্রাণে,
—মন নাহি মানে!

ভাবি আজ গেছে বসন্ত, এবার দুখ হবে অন্ত,
তবু ডাকে পোড়া পাখি করুণ গানে,
—মন নাহি মানে!

না এলে যদি প্রভাতে, আছি আশায় আঁধার রাতে,
সংসার যে আসে কাছে তোমার ভানে!
—মন নাহি মানে!

এসো তুমি ভবের মেলায়, এসো আমার ধুলা-খেলায় ;
পাই যেন নাথ! তোমায় কাছে সকল টানে,
—মন নাহি মানে।

১৭

জয়শ্রী

ক্ষমিয়ো হে শিব, আর না কহিব,
—দুঃখ-বিপদে ব্যর্থ জীবন মম।

মৃত্তিকা বলে মোরে, ওরে মূঢ় নর!
হৃদয়-আঘাতে তব কেন এত ডর?
দীর্ণ মম বক্ষ যত, আঘাত যত খর,
শস্য সুফল ততো, ততোই শ্যাম মনোরম।

আকাশ বলে মোরে, আমি কাঁদি যবে
হাসে বসুন্ধরা ফুল্ল বিভবে ;
তোমারও নয়ন-বারি বিফল না হবে,
শুষ্ক জীবনে তব ফুটিবে ফুল অনুপম।

১৮

কর্ণাটি

বিঘ্নহরণ সুখবিধায়ক নায়ক একচ্ছত্র বিশ্বেশ্বর,
ধরণীধর জগপতি গুরু মহেশ।

ঋদ্ধি-সিদ্ধি বিধাতা, গুণীন্দ্র মহান,
বিপদকলুষহর কৃপানিধি বিধি
অসীম চির-অবিনাশ
দুখীজন-পিতা পাতা বন্ধু দীনেশ।

১৯

মিশ্র খাম্বাজ

এ মধুর রাতে বলো কে বীণা বাজায়?
আপন রাগিণী আপন মনে গায়।

নাচিছে চন্দ্রমা সে গীত-ছন্দে,
গ্রহ গ্রহে ঘিরি নাচে আনন্দে,
গোপন গানে হেন কে সবে মাতায়?

যাঁর যন্ত্রে হেন মোহন তন্ত্র,
যাঁর কণ্ঠে হেন মোহন মন্ত্র,
না-জানি সুন্দর সে কী শোভায়!

কোথা সে বীণা, কোথা সে বাণী,
কোথা সে শতদল ফোটে না-জানি,
প্রাণ-মরাল চাহে ভাসিতে তাঁর পায়।

২০

মিশ্র দেশ

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখি,
কেমনে বলো তাঁরে ডাকি?
কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি?

কুসুম লয়ে গন্ধ বরণ,
নিতি-নিতি যাঁরে করিছে বরন,
এ কণ্টক-বনে কী করি চয়ন,
কোন্ ফুলে বলো সে পদ ঢাকি?

নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে,
যখন গাবে না পাখি ;
কণ্টক দিব চরণে, যবে
কুসুম মুদিবে আঁখি।

হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভালো,
কেন তুমি মোরে করিলে কাঙাল?
বলো হে হরি! আর কত কাল
সুদিনের লাগি রহিব জাগি?

২১

ভৈরবী

আমার আবার যখন প্রভাত হবে,
মেঘগুলি সব সরে যাবে,
এমনি করে রাঙিয়ো নাথ!
আমায় এমনি করে রাঙিয়ো।

ঘুমটি আমার পাখির ডাকে
নবীন ভানুর তরুণ রাগে
এমনি করে ভাঙিয়ো নাথ,
এমনি করে ভাঙিয়ো।

অশ্রু-ঝরা মেঘের মালা,
সাজায় যেমন গিরির গলা ;
তেমনি আমার আশার মালা
তোমার গলায় পরিয়ো নাথ!
তোমার গলায় পরিয়ো।

বহুদিনের তপে সতী
পাষাণ ভেদি পেল পতি ;

তেমনি জীবন-পাষাণ ভেঙে,
(আমার) পরানখানি মাগিয়ো নাথ!
পরানখানি মাগিয়ো।

২২

কীর্তন-ঝাঁপতাল

আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়
বলছ হরি, আমায় ধর!
আঘাত দিয়ে কহ মোরে,
এই তো আমার কর।

হাত বাড়ায়ে ম'লেম ঘুরে,
কাছে থেকেও রইলে দূরে ;
এত আমার আপন হয়েও
রইলে সদা আমার পর।

ফুরায়ে যে এল বেলা,
সাঙ্গ কবে করবে খেলা?
(হরি) তুমি কর তোমার লীলা
আমার প্রাণে লাগে ডর।

শকতি নাই তোমায় ধরি,
হার মেনেছি, হে শ্রীহরি।
দিয়ে খুলি, চোখের ঠুলি
দেখা দাও হে দুঃখহর।

২৩

পিলু

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে,
বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই ;
দুজন যদি হত আপন,
হত না মোর আপন সবাই।

নিত্য আমি অনিত্যরে
আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধ ঘরে,
কেড়ে নিলে দয়া করে
তাই হে চির! তোমারে চাই।

সবাই যেচে দিত যখন
গরব করে নিইনি তখন,
পরে আমায় কাঙাল পেয়ে
বলত সবাই, নাই গো নাই।

তোমার চরণ পেয়ে হরি!
আজকে আমি হেসে মরি ;
কী ছাই নিয়ে ছিলাম আমি,
হায় রে, কী ধন চাহি নাই!

২৪

সাহানা

চিত্তদুয়ার খুলিবি কবে মা,
চিত্তকুটিরবাসিনি!
অন্ধ ভিখারি রয়েছি দাঁড়ায়ে,
ওগো নয়নবিকাশিনি!

রাজপথে-পথে ঘুরিলাম কত,
লভিনু যত-না হারাইনু ততো,
মিটিল না ক্ষুধা, মিলিল না সুধা,
ওগো সন্তাপনাশিনি!

আজি ফিরিলাম-ঘরে দীন-শ্রীহীন,
সংসার-ধুলায় ম্লান-মলিন,
বসিবি কি হেন জীবন-পঙ্কে
—ওগো পঙ্কজবাসিনি?

২৫

বাউল

মানুষ যখন চায় আমারে, তোমারে চাইনে হরি।
তাইতে বুঝি দাও না ধরা ; যখন তোমায় খুঁজে মরি?

নও তো শুধু ব্যথার ব্যথী, তুমি যে মোর চিরসাথি ;
যখন থাকি সুখের মোহে, সেই কথা যে যাই পাসরি।

বিফল ধন-রতন খুঁজি হারাই আমি ঘরের পুঁজি ;
তাই তো আমি ঘাটে এসে, পাইনে খুঁজে পারের কড়ি।

এবার যখন ডাকবে তারা, দিব না দিব না সাড়া ;
যখন তারা টানবে আমায়, রব তোমার চরণ ধরি।

২৬

বেহাগ-খাম্বাজ

ওহে জগতকারণ! এ কি নিয়ম তব?
একি মহোৎসব, এ কি মিলন নব?

গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে,
অণু অণুরে ডাকে চির-অনুরাগে!
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম-সোহাগে,
অখিল নিখিল-ভরা একি আহ্বান-রব?

সে নিয়মে জীবগণ সুখ-দুঃখ-অন্ধ ;
প্রেম-পারিজাতে, প্রভু, একি মকরন্দ?

দুইটি অন্তর তাই দূরান্তর হতে
করিছে শপথ আজ মিলি একসাথে,
—প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে,
তুচ্ছ দৈন্য, অতি তুচ্ছ বিভব।

২৭

খট্

দাও হে, ওহে প্রেমসিন্ধু! দাও এ নবীন যুগলে
তোমার প্রেমের মধুর বিন্দু সুর-নর-চিত-বাঞ্ছিত।

যে প্রেমের শুধু প্রেম পরিণাম,
তোমাতে উদয় তোমাতে বিরাম,
বিষয়-বাসনা, ধন-জন-মান
যে প্রেম করে না লাঞ্ছিত।

দুইটি হৃদয় হয়ে একাকার,
স্বার্থের বাঁধ করিয়া বিদার
বিশ্বের বুকে চলুক উদার
কখনো না হয়ে কুণ্ঠিত।

টেনে লও, ওহে প্রেম-পারাবার!
তব শুভ কোলে হৃদি দুজনার,
তোমার মধুর কঠোর শাসনে,
কখনো কোরো না বঞ্চিত।

২৮

বেহাগ-খাম্বাজ

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব-কলিকা হউক সুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া।

প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ সব বন্ধন টুটিয়া,
আজি মন চায়, অঞ্জলি লয়ে ধাই তব পানে ছুটিয়া।

যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে স্নেহের সাগর মথিয়া ;
সে নামের সাথে তব পূত নাম থাকে যেন সদা গ্রথিয়া!

হাসি দিয়া এরে করো গো পালিত তব স্নেহকোলে রাখিয়া
নয়নেতে দিয়ো, মা গো স্নেহময়ি! প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া ;

যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে যায় না কুসুম ঝরিয়া ,
রক্ষিয়ো নাথ, তোমার বক্ষে সকল দুঃখ হরিয়া।

দেখো প্রভু! দেখো, চালাইয়ো এরে তুমি নিজ হাতে ধরিয়া ;
মঙ্গল-পানীয় দিয়ো তুমি দিয়ো পরান-পাত্র ভরিয়া।

হোক এ কোমল শিশু সকলের প্রেমে বাড়িয়া ;
সে জীবনে, প্রভু! যেন কোথা কভু না যায় তোমারে ছাড়িয়া।*

২৯

সুরাট-মল্লার

হরি! তোমারে পাব কেমনে?
যেতেছে সময়, ওহে দয়াময়!
দয়া করো দীনজনে।

ভুলেছিনু যবে ভবের খেলায়
হারাইনু কত সুদিন হেলায়,
বুঝি নাই, প্রভু, চলিবে না কভু
তোমার চরণ বিনে ;

বুঝাইলে, হরি, বুঝালে এবার,
সবাকার হতে তুমি আপনার ;
তোমারে পাইলে সরস সংসার,
বিরস তোমা বিহনে।

তাপিত চিতে এ মিনতি করি,
লুকাইয়ে আর থাকিয়ো না, হরি!
দেখিলে তো তুমি তোমারে পাসরি
কাটাই দিন কেমনে?

কাটো হে আমার স্বার্থের পাশ.
তব প্রিয় কাজে করো মোরে দাস,
সাধো এ জীবনে তব অভিলাষ
হরষে কিম্বা বেদনে।

* কিশোর বয়সে ছোট বোন 'তপ্সির' (কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কনিষ্ঠা কন্যা) অন্নপ্রাশন উপলক্ষে লেখা।

৩০

বাউল

তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর কোন্ মুখে?
শাসন তোমার যতই গুরু, ততোই টেনে লও বুকে।

সুখ পেলে দিই অবহেলা,
শরণ মাগি দুখের বেলা ;
তবু ফেলে যাও না চলে, সদাই থাক সম্মুখে।

প্রতিদিনের অশেষ যতন,
ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন ;
নিত্য আছি ডুবিয়ে তাই পাসরি প্রেমসিন্ধুকে।

সুখের পিছে মরি ঘুরে,
তাই তো সুখ পালায় দূরে ;
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে।

ভুলে যাই সবাই আমার,
নই তো ভিন্ন আমি সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদব আমি কোন্ দুখে?

ভবের পথে শূন্য থালি,
বেড়াই ঘুরে দীন-কাঙালি,
দৈন্য আমার ঘুচবে যবে পাব দীনবন্ধুকে।

৩১

বাউল

হে অজানা, আমি তোমায় জানব কবে?
জীবন-রবি আর তো নাহি পুরবে।

যতই দেখি যতই শুনি আমি শুধু অবাক মানি,
কিছু না জানি।
তারা নয়তো এমন গুণী যাদের আমি জানি এ ভবে।

জীবন-হাটে কিনিতে সুখ কিনে আনি কেবলি দুখ,
বেদনা-ভরা বুক ; (তোমায় জানিনে বলে।)

যে তোমায় পেয়েছে ডেকে,   থাকে সদাই হাসিমুখে,
চির সুখে!
ঘাটে যখন ডাকবে মাঝি,   তাদের যেমন হাসি তেমনি রবে,
(তোমায় জেনেছে বলে)।

ঘরে শুধু পাঁচটি প্রাণী,   তবু করি টানাটানি,
হানাহানি ; (তোমায় ঘরে পাইনি বলে) ;
যে তোমার পেয়েছে খবর, তার সবাই আপন, কেহ নয় পর,
বিশ্ব তাহার ঘর।
যে তোমায় করেছে আপন   সে আপন করেছে সবে।

৩২

ভৈরবী

রইল কথা তোমারি, নাথ! তুমিই জয়ী হলে।
ঘুরে-ফিরে এলাম আবার তোমার চরণ-তলে।

কুড়িয়ে সবার ভালোবাসা,
ভবের ডালে বাঁধনু বাসা,
ঝড় এসে এক সর্বনাশা
(হে নাথ) ফেলল ভূমিতলে।

পক্ষ আমার গেল ভেঙে,
বক্ষ আমার গেল রেঙে,
তুলতে যারে বলছি মেঙে,
(হে নাথ), সেই চলে যায় দলে।

নয় তো তোমার দুয়ার বন্ধ,
আমারি নাথ, দু-চোখ অন্ধ,
মিছে তোমায় বলি মন্দ,
(হে নাথ) আজ কে দিল বলে!

তাই তো তোমায় দেখতে নারি,
দাও হে দেখা, হে কাণ্ডারি,
দর্প আমার, দর্পহারী,
(হে নাথ) ফেলে এলাম জলে।

৩৩

সিন্ধু

লয়ে যাও প্রভু, আজি জীবন-জলধি-পারে,
যেথা বিরাজেন তিনি লইয়া গিয়াছ যাঁরে।

নয়নে না দেখি বেলা,
শুধু তরঙ্গেরি খেলা,
জীর্ণ মানস-ভেলা,
তুমি পার করো তারে।

তাঁহারে হারায়ে মোরা,
দিশাহারা, শান্তিহারা ;
দেখো, নয়নে বহিছে ধারা,
তুমি বিনা কে নিবারে?

৩৪

বেহাগ

মিলিল আজি পথিক দুজন জীবন-পথের মাঝে ;
দেখাও সুপথ, হে পথের পতি! দেখাও দিবসে-সাঁঝে।

যেথায় অজানা মিলে শত পথ,
চারিদিকে যাত্রী করে যাতায়াত,
চালাও যে পথে তোমার তীরথ,
তোমার মন্দির রাজে।

পথ-পাশে যবে মেলে সুখ-মেলা,
সুখী হোক খেলি হরষের খেলা ;
সে খেলায় যেন নাহি করে হেলা,
বিরস জীবন-কাজে।

যদি কভু রাতে নিবে যায় বাতি,
দেখাইয়ো নাথ, তব মুখ-ভাতি,
বন্ধুর পথে, হে জগবন্ধু,
থেকো সদা কাছে-কাছে।

৩৫

রামপ্রসাদী মালসী

আর 'দে দে' বলব না তোরে ;
যা দিলি তুই, কাঙাল-রানী!
তাই তো আবার নিলি হরে।

নে মা, আমার ধন-পদ-মান
জীবন-ডালা শূন্য করে ;
আমি শূন্য ডালা দিব তব পায়,
যদি পূজার মালা না দিস মোরে।

দিস যদি মা, দুঃখ-বিপদ,
তুলে দে মা, মাথার 'পরে ;
যখন বোঝা হবে ভারী,
তুই নাবাবি আপন করে।

তোর নেবার মতো নই মা আমি,
তবু কেন এ দীনের দ্বারে?
তুই মা আমার পরশমণি,
আদরে নে পরশ করে।

৩৬

বেহাগ খাম্বাজ

তখনি তোরে বলেছিনু মন,
যাস নে রে তুই এ বিপথে, মানলিনি তখন।

কাঁটার ভয়ে ছাড়লি সুপথ,
সুগম ভেবে ধরলি বিপথ,
ছ-জনায় তোর পথের সম্পদ
করিল হরণ।

সাথের সাথি ভাবলি যারা,
কোথায় এখন রইল তারা?
এবে বিজন বনে পথ-হারা,
সজল নয়ন।

দুখের বোঝা লয়ে শিরে,
চল্ রে ভোলা, চল্ রে ফিরে,
ভরসা তোর এ তিমিরে
হরির চরণ।

৩৭

সিন্ধু কাফি

বুঝেছি হে ছদ্মবেশী, ছলনা তোমার,
আর না ডরিব আমি, ভুলিব না আর।

দরশনে রুদ্র তুমি, অন্তরেতে শিব ;
দুঃখবেশী সুখ তুমি, বিপদে বিভব।
অনলে পরখি লহ জীবন সবার ;
দহিয়া রাঙাও তারে, কর না অঙ্গার।

কুটিরে নিবাস তব, ওহে মহারাজ!
প্রাসাদে ধর হে তুমি দরিদ্রের সাজ ;
মৃত্যুর বিভূতি অঙ্গে, কণ্ঠে মৃত্যুহার ;
মৃত্যুঞ্জয়, জীবনের তুমি মূলাধার।

নিজেরে লুকাও তুমি কত আবরণে ;
পাইনি ধরিতে তোমায় শত আহরণে,
দস্যুবেশে এলে গৃহে ভাঙিয়া দুয়ার,
এবার পড়িলে ধরা হে বন্ধু আমার!

৩৮

মিশ্র বাউল কীর্তন

আর কত কাল থাকব বসে দুয়ার খুলে,
—বঁধু আমার?
তোমাব বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে?
—বঁধু আমার?

বাহিরের উষ্ণ বায়ে মালা যে যায় শুকায়ে,
নয়নের জল বুঝি তাও, বঁধু মোর, যায় ফুরায়ে ;
শুধু ডোরখানি হায় কোন্ পরানে তোমার গলায় দিব তুলে?
—বঁধু আমার?

হৃদয়ের শব্দ শুনে চমকি ভাবি মনে,
ওই বুঝি এল বঁধু ধীরে মৃদুল চরণে ;
পরানে লাগলে ব্যথা ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে ;
—বঁধু আমার!

বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল,
কত যে মনের আশা মন-মাঝে রহিল ;
কী লয়ে থাকব বলো তুমি যদি রইলে ভুলে?
—বঁধু আমার!

৩৯

কীর্তন

যদি দুখের লাগিয়া গড়েছ আমায়, সুখ আমি নাহি চাই ;
শুধু আঁধারের মাঝে তব হাতখানি খুঁজিয়া যেন গো পাই।

যদি নয়নের জল না পার মুছাতে ;
যদি পরানের ব্যথা না পার ঘুচাতে,
তবে, আছ কাছে আছ, হে মোর দরদি,
কহিয়ো আমারে তাই।

যদি হৃদয়ের প্রেম নাহি চাহে কেহ,
পাই অবহেলা, নাহি পাই স্নেহ,
তবে দিয়াছিলে যাহা, হে মোর বিধাতা,
ফিরিয়া লহো গো তাই!

যদি না পারি পুরাতে মনের বাসনা,
যায় হে বিফলে সকল সাধনা,
যেন এ দীন জীবনে, হে দীনের নিধি,
তোমারে নাহি হারাই!

৪০

ভৈঁরো

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া,
তুমি তো আমার রহিবে!
বহিবারে যদি নাহি পারি এ ভার,
তুমি তো, বন্ধু, বহিবে।

কলুষ আমার, দীনতা আমার,
তোমারে আঘাত করে শতবার ;
আর কেহ যদি না পারে সহিতে,
তুমি তো, বন্ধু, সহিবে।

যাক ছিঁড়ে যাক মোর ফুলমালা,
থাক্ পড়ে থাক্ ভরা ফুলডালা।
হবে না বিফল মোর ফুল তোলা
তুমি তো চরণে লইবে।

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার ;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল,
যতই অনলে দহিবে।

৪১

কীর্তন

যবে মানবের বিচারশালায় অবিচার পাব দান ;
যখন লুকানো নিন্দা আমারে আঁধারে হানিবে বাণ ;
সহিব নীরবে, কহিব তখন,
—তুমি জান, নাথ, তুমি জান!

ভবের সভায় যশের মুকুট দেয় যদি তারা শিরে,
পারি যেন দিতে সরল বিনয়ে তাদের চরণে ফিরে ;
বলি যেন তবে,—হীনতা আমার
—তুমি জান, নাথ, তুমি জান!

লক্ষ্যের দিকে যদি আসে মেঘ বিপদের পাখা খুলে,
যদি ভবপারে সবে ডাকে মোরে, 'লাগাও তরণী কূলে',

চলিব আঁধারে, বলিব তখন,
—তুমি জান, নাথ, তুমি জান!

ফুরায় যে সুখ, ফুরায় যে দুঃখ, না ফুরায় শুধু আশা ;
ভাঙে যতবার গড়ি ততবার ধূলায় ধূলির বাসা ;
কেন এ যতন? কোথা সে রতন?—
—তুমি জান, নাথ, তুমি জান!

৪২

ভৈরবী

হে দীনবন্ধু, পার করো।
পার করো তরী, পার করো, পার করো।
বিশাল সিন্ধু দুস্তর—পার করো।

ভাঙা এ ভেলা, আমি একেলা,
দূরে গরজে জলধর ;
হে ভয়হারী, ভয় হরো।

মোহ-কুয়াশায়, দিক নাহি ভায়,
হে ভবমাঝি, হাল ধরো।

জীবনতরী কলুষে ভরি,
শূন্য করি তব ঠাঁই করো,
হে দীনত্রাতা, দীনে তরো।

৪৩

মিশ্র সাহানা

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে?
আমার মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হয়ে রবে—কবে?

আমার সকল সুখে, সকল দুখে,
তোমার চরণ ধরব বুকে ;
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই কবে।

কিনব যাহা ভবের-হাটে
আনব তোমার চরণ-বাটে ;
তোমার কাছে, হে মহাজন,
সবই বাঁধা রবে—কবে?

স্বার্থ-প্রাচীর করে খাড়া,
গড়ব যবে আপন কারা,
বজ্র হয়ে তুমি তারে
ভাঙবে ভীষণ রবে।

পায়ে যখন ঠেলবে সবাই,
তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই!
জগতের সকল আপন হতে
আপন হবে—কবে?

শেষে ফিরব যখন সন্ধ্যাবেলা,
সাঙ্গ করে ভবের খেলা,
জননী হয়ে আমায়
কোল বাড়ায়ে লবে।

৪৪

কীর্তন

পরানে তোমারে ডাকিনি, হে হরি,
ডেকেছি শুধুই গানে ;
তাই তো তোমারে পাইনি জীবনে ;
ফিরেছি শূন্য প্রাণে।

তুমি চাহ প্রাণ, নাহি চাহ ভাষা ;
চাহ দীন বেশ, নাহি চাহ ভূষা ;
গাহিনি সে গান তুমি শুন যাহা, আর কেহ নাহি শোনে।

তুমি সবাকার হতে আপনার,
সে কথা বুঝিতে বাকি নাহি আর :
তবু শত ঠাঁই শত-বার ধাই, চাহি না চরণ-পানে।

শিখাও আমারে গাহিতে সে সুরে,
যা শুনি থাকিতে পারিবে না দূরে ;
আসিবে হৃদয়ে তব বীণা লয়ে মাতাবে নূতন তানে।

৪৫

সিন্ধু কাফি

তবু তোমারে ডাকি বারে-বারে,
কত যে পেতেছি ব্যথা না বুঝি তোমারে!

জানি না কেন যে দাও, কাঁদায়ে ফিরায়ে নাও,
তুমি তো ভোল না বিধি নয়ন-আষারে!

বলো হে কবে জানিব, শ্মশানেতে তুমি শিব :
তোমারে সুখে বরিব দুঃখের মাঝারে।

বুঝেছি সুখ যে মায়া, বুঝাও দুখও যে ছায়া,
তুমি যে রয়েছ সুখ- দুঃখের ওপারে!

মনে হয় তব কাছে সব হারাধন আছে,
তাই তো এসেছি হে নাথ তোমার দুয়ারে!

৪৬

পূরবী

দিয়েছিলে যাহা, গিয়াছে ফুরায়ে,
ভিখারির বেশ তাই ;
ফুরায় না যাহা এবার সে ধন
তোমার চরণে চাই।

সুখ আমারে দেয় না অভয়,
দুঃখ আমারে করে পরাজয় ;
যত দেখি ততো বাড়িছে বিস্ময়,
যাহা পাই তা হারাই।

ভবের মেলায় কতই খেলনা
কিনিলাম, তবু সাধ তো গেল না ;
ঘাটে এসে দেখি কিছু নাই বাকি ;
কে দিবে তরীতে ঠাঁই!

দাও হে বিশ্বাস, দাও হে ভকতি,
বিশ্বের হিতে দাও হে শকতি ;
সম্পদে-বিপদে তব শিবপদে
স্থান যেন সদা পাই।

৪৭

হাম্বীর

আমার পরান কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে।
কে যেন ডাকিছে মোরে, দূর সাগর-পারে
বিরহ-বিধুর সুরে।

বাতাসে তাহারই কথা, তরঙ্গে তারই বারতা,
জোছনা পথ তার দেখায়, দেখায় দূরে।

হে অধীর হে উদাসী, হে মম অন্তরবাসী,
কাহার শুনিলে বাঁশি, কোন্ প্রেমের পুরে?

যে দিগন্তে নীলাম্বরে, চুম্বিছে সে নীলাম্বুরে,
সেথা মোর নীলকান্ত চায়, মোরে চায়,
ওগো. চায় কত মধুরে!

৪৮

ভৈরবী

সে ডাকে আমারে।
বিনা সে সখারে
রহিতে মন নারে!

প্রভাতে যারে দেখিবে বলি,
দ্বার খোলে, কুসুম-কলি,

কুঞ্জে ফুকারে অলি
যাহারে বারে-বারে।

নিঝর-কলকণ্ঠ-গীতি বন্দে যাহারে
শৈল-বন-পুষ্পকুল নন্দে যাহারে ;
যার প্রেমে চন্দ্র-তারা
কাটে নিশি তন্দ্রা-হারা,
যার প্রেমের ধারা
বহিছে শত-ধারে!

৪৯

মিশ্র আশাবরী

ওগো নিঠুর দরদি! এ কী খেলছ অনুক্ষণ?
তোমার কাঁটায় ভরা বন, তোমার প্রেমে ভরা মন!

মিছে দাও কাঁটার ব্যথা,
সহিতে না পার তা,
আমার আঁখি-জল
(তোমায়) করে গো চঞ্চল—
(তাই) নয় বুঝি বিফল
আমার অশ্রু-বরিষণ!

ডাকিলে কও না কথা,
কী নিঠুর নীরবতা।
আবার ফিরে চাও,
বল,—ওগো শুনে যাও,
তোমার সাথে আছে আমার
অনেক কথন।

৫০

কীর্তন

ওগো সাথী! মম সাথী! আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে-পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক-মাথে।

যে-পথে কাননে আসে ফুলদল,
যে-পথে কমলে পশে পরিমল,
যে-পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে!
(আমি সেই পথে যাব সাথে।)

যে-পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে ;
যে-পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে।
(আমি সেই পথে যাব সাথে।)

যে-পথে পাখিরা যায় গো কুলায়,
যে-পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে-পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির-রাতে।

৫১

জৌনপুরী

তব চরণতলে সদা রাখিয়ো মোরে
দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু শান্তি-সুধা দিয়ো চিত্ত-চকোরে।

কাঁদিছে চিত 'নাথ' 'নাথ' বলি
সংসার-কান্তারে সুপথ ভুলি,
তোমার অভয় শরণ আজি মাগি
দেখাও পথ আজ তিমিরে।

মন্দ-ভালো মম সব তুমি নিয়ো,
দুঃখী-জন-হিত সাধিতে দিয়ো,
হে নারায়ণ, দীন রূপে আসিয়ো
বাঁধিয়ো সবে মম প্রেম-ডোরে।

৫২

আশাবরী

এড়াতে পারলে না আজ প্রভাতে :
আমার ফুলের ফাঁদে পড়লে ধরা গন্ধে আর ওই শোভাতে।

ভেবেছিলে গোপন রেণু, ঢাকবে তোমার মোহন বেণু ;
লুকাতে পারলে না গো সুন্দরের এই সভাতে।

দুঃখশোকের ভগ্ন ভিতে, এসেছিলে অলক্ষিতে,
স্বার্থ-সুখের দুয়ার দিয়ে পথ পেলে গো পালাতে।

আমার বঁধুর আনাগোনা, কোন্ পথে তা কেউ জানে না।
শুধু নূপুর যায় গো শোনা পথিকের মন লোভাতে।

৫৩

জয়জয়ন্তী

এসো গো একা ঘরে একার সাথী।
সজল নয়নে বল রব কত রাতি ?

সুনীল আকাশে চন্দ্র বিকাশে
তামস নাশে,
এ আঁধারে হাসিবে কবে তব মুখ-ভাতি ?

তোমারে গোপন ব্যথা জানাব গোপনে,
তোমারে কুসুম-মালা পরাব যতনে।

তব সঙ্গ মাগি আছি আমি জাগি,
সরব-তেয়াগী ;
তব চরণ লাগি আছি কান পাতি।

৫৪

সিন্ধু কাফি

যখন তুমি গাওয়াও গান তখন আমি গাই।
গানটি যখন হয় সমাপন— তোমার পানে চাই।

আরও কি মোর গাইতে হবে ? নয়ন-জলে নাইতে হবে ?
আরও কি মোর চাইতে হবে, দিলে না যা তাই ?

যে সুর তুমি গেয়েছিলে,   যে কথাটি কয়েছিলে,
বারে-বারে আমি তারে   যাই যে ভুলে যাই।

এবার তুমি বিজন রাতে,   গানটি ধরো আমার সাথে,
তোমার ওই তানপুরাতে,   সুরটি মোর মিলাই।

৫৫

মিশ্র খাম্বাজ

(আমি) বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার।
একাকী   বাহিতে তারে   পারি নে যে আর।

প্রভাত-হিল্লোলে ভুলে   দিয়েছিনু পাল তুলে,
ভাবিনি হবে সহসা   এমন আঁধার।

ঝড়েতে বাঁধন টুটে,   দিশাহারা এনু ছুটে,
তাই তরী তব তটে   লাগিল এবার।

এখনো যা-কিছু আছে, তুলে লহো তব কাছে,
রাখো এই ভাঙা নায়ে   চরণ তোমার।

৫৬

বাউল

ওরে বন, তোর বিজনে সংগোপনে কোন্ উদাসী থাকে?
আমার মনের বনের উদাসীরে ডাকে সে আজ ডাকে

নিজে সে নীরব হয়ে রয়,
শোনে সে ফুল যে কথা কয়
তরুর হিয়া আলিঙ্গিয়া লতার অনুনয়,
শোনে সে লতার অনুনয়।
পাখিদের প্রগল্‌ভতা দেয় কি ব্যথা তাকে?

কেউ তারে পায়নাকো ডাকি,
থাকে সে সদাই একাকী ;
কোন্ একাকী করল তারে এমন একাকী?
তারে বৃথা খোঁজে চন্দ্র তপন পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

আজি মন বিবাগী-চঞ্চল,
বিরহে চক্ষু ছল্ ছল্ ;
সদাই ভনে—ওই বিজনে আমায় নিয়ে চল্!
ওরে মোর পাগ্‌লা পরান, পাবি কি তুই তাকে?

৫৭

বাউল-কীর্তন

মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে,
ও আকাশ, বল্ আমারে।
কেউ-বা রঙিন ওড়না গায়ে, কেউ সাদা, কেউ নীল বেশে।

তারা কোন্ যমুনার নীরে ভরবে গাগরি,
কার বাঁশরি শুনল এরা সাগর-নাগরী, মরি-মরি!

তারা বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর-ঝুমুর, যায় চলে কার উদ্দেশে?
—ও আকাশ, বল্ আমারে।

কভু বাজিয়ে ডমরু তারা উল্লাসে নাচে,
কভু ভানুর সনে খেলে হোলি, প্রভাতে-সাঁঝে, মরি মরি!
তারা বিধুর সনে কী কথা কয় উজ্জ্বল মধুর হেসে!
—ও আকাশ, বল্ আমারে।

আকাশ, বল্ রে আমায় বল্, আমার আঁখি-জল,
তাদের মতো জীবনখানি করবে কি শ্যামল—আমায় বল্ রে।
(আমি তাদের মতো) আমার বঁধুর সনে মধুর খেলা,
খেলব কি দিনের শেষে?
—ও আকাশ, বল্ আমারে।

৫৮

বাউল

প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল্ লো বধূ!
ঘোমটাখানি খোল্।
আছি আজ পরান মেলি দেখব বলি
তোর নয়ন সুনিটোল লো বধূ!
নয়ন সুনিটোল।

কত আর নীরব রবি,
কবে তুই ফিরে চাবি,
মোরে বরি লবি বধূ।
কবে জীবন-বাসর-বাটে
বাজবে শঙ্খ-ঢোল লো বধূ!
বাজবে শঙ্খ-ঢোল?

আজি নিখিল-কুঞ্জ-বনে,
মিলব পরম বধূর সনে,
বড় সাধ মনে বধূ!
এ মোহন রাতে, আমার সাথে
বিশ্ব-দোলায় দোল্ লো বধূ!
বিশ্ব-দোলায় দোল্!

৫৯

কে গো তুমি, বিরহিনি, আমারে সম্ভাষিলে?
এ পোড়া পরান-তরে এত ভালোবাসিলে?

কভু হরিত বসনে সাজি,
কুসুমে ভরিয়া সাজি,
মধুমাসে মধু-হাসে মম পানে হাসিলে।
কে আমারে সম্ভাষিলে?

শারদ নিশীথে যবে
বিরহে রহি নীরবে,
পীত কায়ে মৃদু পায়ে মম পাশে আসিলে!
কে আমারে সম্ভাষিলে?

কভু বাদলে ঢাকি বয়ান
করিলে গভীর মান,
দামিনীর গুরু-ভাষে আঁখি-নীরে ভাসিলে!
কে আমারে সম্ভাষিলে?

আমি শ্যাম, তুমি রাধা,
তাই বধূ, এত বাধা ;
তুমিও হায় উদাসিনী, মোরেও উদাসিলে!
কে আমারে সম্ভাষিলে?

৬০

আসোয়ারী

আমার ঘুম-ভাঙানো চাঁদ!
আমার মন-ভাঙানো চাঁদ!
তুমি যাও গো সরে।
বাতায়নে আমার পানে
চেয়ো না অমন করে।

বিধু, তুমি বধূর রূপে,
এলে ঘরে চুপে-চুপে,
নয়নে করলে পরশ কিরণ-করে।

কোয়ো না পুরানো কথা,
দিয়ো না পুরানো ব্যথা,
এনো না পুরানো প্রদীপ আঁধার ঘরে।

জানি, ওগো সর্বনাশী,
জানি তব মোহন হাসি,
জানি তব ভালোবাসা দুদিন-তরে।

৬১
পিলু

বন দেখে মোর মনের পাখি
ডাকল গো আজ ডাকলো গো!
অনেক দিনের ঘুম ভেঙে সে
জাগল গো আজ জাগলো গো!

হাত বাড়ায়ে অযুত শাখায়,
ডাকে বন, আয়, আয়, আয়,
ভাঙি মোর সোনার খাঁচা
ভাগল গো সে ভাগল গো।

যেন আজ বিদেশ ছেড়ে,
ঘরেতে এল ফিরে ;
আপন দেশের শীতল হাওয়া
লাগল গো গায় লাগল গো!

সবুজের সহজ টানে,
মানা আর নাহি মানে ;
অমৃতের ফল বুঝি আজ
পাকল গো আজ পাকল গো!

৬২

পিলু খাম্বাজ

বাদল ঝুম্‌-ঝুম্‌ বোলে,
না জানি কী বলে!
বুঝিতে পারি না কথা,
তবু নয়ন উছলে।

কাহার নূপুরধ্বনি
শুনাইছে আগমনী?
বিরহী পরান তারে যাচে ;
আশা-ময়ূরগুলি পুচ্ছ মেলি নাচে ;
রাখিব পরানখানি তার চরণতলে!

৬৩

সাওয়ন

ঝরিছে ঝর-ঝর, গরজে গর-গর,
স্বনিছে সর-সর, শ্রাবণ মাঃ।

তটিনী তর-তর, সরসী ভর-ভর,
ধরণী থর-থর, সিকত গা।

বিরহী ধর-ধর, মানিনী সর-সর,
চাহিছে খর-খর সুলোচনা।

বালিকা দলে-দলে, চলিছে গলে-গলে
বিটপী-তলে-তলে ঝোলে ঝুলা।

কৃষক হলে-হলে, বলাকা জলে-জলে,
নাচিছে টলে-টলে, শিখীর পা।

পরান পলে-পলে পড়িছে ঢলে-ঢলে,
উঠিছে বলে-বলে, —তুমি কোথা?

৬৪

বেহাগ

আজি এ নিশি, সখী, সহিতে নারি,
কেবলই পড়িছে মনে যমুনা-বারি।

এমন সোনার তরী ভেসেছিল নভোপরি,
নাহিকো শ্যামের তরী, নাহি বাঁশরি।

ছিল গো সেদিন, সখী, হেন যামিনী!
আছে ফুল নাহি মধু, আছে আশা নাহি বঁধু,
আছে নিশা, নাহি শুধু অভিসারী।

মিলন-মধুর নিশি আসিবে না আর ;
আজি এ চাঁদিনী ধরা, বিরহ-বেদন-ভরা,
আকাশের গ্রহ-তারা শ্যাম-ভিখারি।

৬৫

নটমল্লার

মোরা নাচি ফুলে-ফুলে দুলে-দুলে,
মোরা নাচি সুরধনী-কূলে-কূলে।

কখনো চলি বেগে, কভু মৃদু চরণে ;
কখনো ছুটি মোরা ফুল-ফল-হরণে।
কোথা হতে এসেছি, কবে যে ভেসেছি,
তা গেছি ভুলে।

খেলি লুকোচুরি কভু বনে ;
মাতি নিধি-সনে কভু রণে ;
ভাসি আকাশে নীরদ-সনে
শত পাল তুলে।

যখন থাকি ঘুমে, থাকে ঘুমে ধরণী,
গহন নদী, নিধি, নভে মেঘ-তরণী ;
পুনঃ জাগে হরষে, মোদের পরশে,
নয়ন খুলে।

৬৬

মিশ্র খাম্বাজ

জাগো বসন্ত, জাগো এবে
মোদের প্রমোদ কাননে।

তুমি জাগিলে জাগিবে ফুল,
বহিবে মলয় মৃদু-মৃদুল,
গাহিবে বিপিনে বিহগকুল,
মোহনমধুর ভাষণে।

পরাও সবারে মোহন-বাস ;
জাগাও হৃদয়ে নবীন আশ ;
হাসুক ধরণী মধুর হাস,
তব শুভ আগমনে।

৬৭

পূরবী

সন্ধ্যাতারা জ্বলিছে গগনে,
আয়-আয় চাঁদিয়া!
আনো গো, সজনী, মধুর রজনী,
সোনার তরণী বাহিয়া।

তাপিত আমি তপ্ত তপনে ;
সুপ্তি-সংগীত গেয়ে যা গোপনে ;
কনক-শ্রাবণে এ মরু-জীবনে
ঢেলে দে স্বপন-অমিয়া।

আকাশ ভাসায়ে মধুর গানে,
পাখিরা উড়ে যায় সুদূর বনে ;
আমার আশাগুলি উড়িছে দিশা ভুলি,
গোধূলি এল, আয় নামিয়া।

৬৮

ভৈরবী

প্রভাতকালে তুলিব ফুল,
খুঁজিব ফুল্ল তরুর মূল।
তুলিব বেলি, যূথী, চামেলি
সৌরভে হবে মন আকুল ;
তুলিব জবা বরন অতুল।

৬৯

নটমল্লার

যাব না,—যাব না,—যাব না ঘরে,
বাহির করেছে পাগল মোরে!

বনের বিজনে মৃদুল বায়,
দুলে দুলে ফুল বলে আমায়,
—ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
পুলক-ভরে।

আকাশের দু-তীরে দু-বেলা
আলো কালো করে হোলি খেলা :
আমারো পরানে লেগেছে রঙ
কালোর 'পরে।

নীল সরে হেম-তরী-'পরে
হাসে নব-বিধু লাজ-ভরে,
—'এসো বঁধু' বলে ডাকে মোরে
মোহন স্বরে।

৭০

বেহাগ

দোলে যামিনী-কোলে,
দোলে রে সোনার শিশু মোহন দোলে!
ফুটেছে কনক হাসি শিশুর মুখ-কমলে!

মেঘের আঁচল টানি,
বারে-বারে মুখখানি
সোহাগে ঢাকিছে যত, ততোই হাসি উথলে!

বালিকা তারকাগুলি,
আসিয়াছে কুতূহলী,
দেখিতে নিশির কোলে নিশির দুলালে।

এসেছে ধরণী-সখী,
রজনীর সুখে সুখী,
মুখ-খানি আলো করি আদরে লইছে কোলে।

৭১

জল বলে, চল্ মোর সাথে চল্,
(কখনো) তোর আঁখিজল হবে না বিফল।
চেয়ে দেখ্ মোর নীল জলে, শত চাঁদ করে টলমল্।

বধূরে আন্ ত্বরা করি,
কূলে এসে মধু হেসে ভরবে গাগরি,
ভরবে প্রেমে, হৃৎকলসি করবে ছলছল্।

মোরা বাহিরে চঞ্চল, মোরা অন্তরে অতল,
সে অতলে সদা জ্বলে রতন উজল!
এই বুকে ফোটে সুখে হাসিমুখে শতদল ;
নহে তীরে, এই নীরে হবি রে শীতল।

৭২

বাহার

আইল আজি বসন্ত মরি-মরি,
কুসুমে রঞ্জিত কুঞ্জ-মঞ্জরি ;
অলি আনন্দিত নাচে গুঞ্জরি,
পিক পুলকিত গাহে কুহরি।

নৃত্য করে কত বাল-বালিকা,
কণ্ঠে শোভে নব কুন্দ-মালিকা
আনিছে সুন্দরী শূন্য গাগরি,
সুখে লহে প্রেম-বারি ভরি-ভরি।

৭৩

মিশ্র

উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী! উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা!
দুঃখ-দৈন্য সব নাশি, করো দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়ো গো, ছাড়ো শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!

জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

কাণ্ডারি নাহিকো কমলা! দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে,
তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।

জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

ভারত-শ্মশান করো পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ, করো পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ-তুঞ্জে,
পুনঃ বিমল করো ভারত পুণ্যে।

জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

অথবা

জননী, দেহো তব পদে ভক্তি,
দেহো নব-আশা, দেহো নব-শক্তি ;
এক সূত্রে করো বন্ধন আজ,
ত্রিংশতি কোটি দেশবাসী-জনে।

৭৪

মিশ্র খাম্বাজ

বলো, বলো, বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব-দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে!

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন-দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা-গোদাবরী
এখনো অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা-বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব-কাহিনী।

বলো, বলো, বলো সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব-দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে!

বিদুষী মৈত্রেয়ী-খনা-লীলাবতী,
সতী-সাবিত্রী-সীতা-অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি,
—আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্র-তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
—আমরা তাঁদেরই সন্ততি।

বলো, বলো, বলো সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব-দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে!

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা :
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা ;
নানক, নিমাই করেছিল ভাই,
সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক-প্রাণ ;
এক-জাতি-প্রেম-বন্ধনে।

বলো, বলো, বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব-দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে ;
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য,
আসিবে আবার আসিবে।

বলো, বলো, বলো সবে, শতবীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব-দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন-এ পূরবে।

এসো হে কৃষক কুটিরনিবাসী,
এসো অনার্য গিরিবনবাসী,
এসো হে সংসারী, এসো হে সন্ন্যাসী,
—মিল হে মায়ের চরণে।
এসো অবনত, এসো হে শিক্ষিত,
পর-হিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
—মিল হে মায়ের চরণে।

এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান,
এসো হে পারসী, বৌদ্ধ, খ্রিস্টিয়ান,
—মিল হে মায়ের চরণে।

৭৫

পিলু বারোয়া

মোরে কে ডাকে—আয় রে বাছা, আয়, আয়!
বহুদিন পরে যেন মায়ের কথা শোনা যায়।

ওগো, তোমার করুণ স্বরে
আপন-জনে মনে পড়ে ;
যাদের ফেলি ধূলি-'পরে
আছি রত নিজ-সেবায়।

ও সুধাবাণী মরমে পশি
পড়িছে মনে স্নেহরাশি ;
আজি, আপন দেশে পরবাসী
থাকিতে মন নাহি চায়।

মা, তোমার করি অপমান
লভেছি বহু যশ-মান ;
আজ লাজে অতি ম্রিয়মাণ,
এ মুখ দেখাতে তোমায়।

মা, ডাকিলে যদি স্নেহ-ভাষে,
রাখিয়ো সদা তব পাশে ;
তুচ্ছ-ধন-পদ-আশে,
আর না যেন দিন যায়।

৭৬

মিশ্র

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির—নাহি ভয়।

ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান,   হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান্ ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়!
জগজন মানিবে বিস্ময়!

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন ;
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—
ওই দেখো প্রভাত-উদয়!
ওই দেখো প্রভাত-উদয়!

ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে,
সত্যের নাহি পরাজয়!
সত্যের নাহি পরাজয়!

৭৭

রামপ্রসাদী মালসী

দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে ,
গলে-গলে এনু, মা, তোর হিন্দু-মুসলমান দু-ছেলে।

এসেছি মা, শপথ করে,
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে ;
যাব না আর পরের কাছে, ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধ হলে।

অনুগ্রহে নাই মুকতি,
মিলন বিনা নাই শকতি,
এ কথা বুঝেছি দোঁহে—থাকব না আর স্বার্থে ভুলে।

থাকবে না আর রেষারেষি,
কাহার অল্প, কাহার বেশি ;
দু-ভাইয়ের যা আছে জমা সঁপিব তোর চরণ-তলে।

দু-জনেই বুঝেছি এবার,
তোর মতো কেউ নেই আপনার ;
তোরই কোলে জন্ম মোদের, মুদব আঁখি তোরই কোলে।

৭৮

কীর্তন

কতকাল রবে নিজ যশ-বিভব-অন্বেষণে?
দু-দিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে!

ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি?
দীনের দুঃখ করো হে মোচন,—দীনের অভাব নাই এ দেশে,
—দীনের ধনেই ধনী তোমরা ;
—দীনবন্ধু হবেন সুখী ;
দীনের দুঃখ করো হে মোচন, —পুণ্য হবে ধন-অরজনে!

দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার-কালো ;
এ আঁধার ঘুচাতে হবে—নইলে এ দেশ এমনি রবে ;
—দানেই এ জ্ঞান দ্বিগুণ হবে ;
—এরাও তোমার মায়ের ছেলে ;
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, —যতনে, অতি যতনে।

পুরানো সে ত্যাগের কথা, হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা?
সেই দেশের মানুষ তোমরা—যেথা রাজার ছেলে হত ফকির!
—যেথা পরের তরে ঝরত আঁখি!
—যেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়!
—যেথা ধনী ছিল দীনের অধীন।
সেই দেশের মানুষ তোমরা, —সে কথা কি আছে মনে?

কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে?
সবাকার মান হোক তব মান, অপমান পর-লাজে।
—সেদিন কবে বা হবে?
জাতিকুল-অভিমান, দ্বেষ-নিন্দা-ভেদজ্ঞান,
ভারতে আনিল মরণ!
—ভাই হে :
কবে হবে এ সুমতি, সবার উন্নতি হইবে সবারই সাধন?
—হেন সাধন আর নাই হে!

এ-হেন সাধনে জীবনে-মরণে পূজিব হে প্রেমসিন্ধু।
মোরা পূজিব তোমায়—সেবার কুসুম কুড়াইয়া ;
—নিজের পূজা ঘুচাইয়া ;
—পরের দুঃখ ঘুচাইয়া,
—ভারতের আশা পুরাইয়া।
তব পদে ঠাঁই, যেন সবে পাই,—দয়া করো, দীনবন্ধু!
ওহে দীনবন্ধু, তুমি দীনজনের লও প্রণতি, নমো দীনবন্ধু।

৭৯

খাম্বাজ

কঠিন শাসনে করো মা, শাসিত।
আমরা দয়ার তব নহি অধিকারী।

ছিলে মা, অতুল-বিভব-শালিনী,
মোদের লাগিয়া হলে কাঙালিনী ;
দীনবেশ তব হেরিয়া, জননী,
নয়নে নাহি অনুতাপ-বারি।

স্বার্থ-মোহে মোরা সতই হতজ্ঞান
আপন দোষে মোরা হারাই নিজ মান ;
ভায়েরে ঘৃণা করি করিয়া অপমান,
পরের কাছে মোরা কৃপা-ভিখারি।

আপন ধন পদ যশের আশায়
মিথ্যা প্রীতি-পূজা জানাই তোমায় ;
প্রাণের অঞ্জলি দিতে নারি পায় ;
যে পদ ধৌত করে জাহ্নবী-বারি।

৮০

ভৈঁরো

জাগো, জাগো, জাগো এবে ;
হেরো পুরব-প্রান্তে ভানু-রেখা,
হে ভারতবাসী!

মঙ্গল-সংগীত শোনো বিহগ-কণ্ঠে ;
পুষ্পে নব-সৌরভ, গগনে নব-হাসি।

দূর অতীত শোনো ডাকে, বৎস, জাগো,
মোদের সম্মান-গৌরব রাখো ;
ভবিষ্যতে শোনো ডাকে কর্মভেরী,
—সুপ্তি পরিহরো, মুক্তি-অভিলাষী।

দক্ষিণে-বামে দেখো জাগে কত জাতি,
নবীন উৎসাহে, নয়নে নব-ভাতি ;
জাগো, জাগাও সবে নব দেশ-প্রেমে ;
শঙ্কা কোরো না হেরি বিপদ-দুঃখরাশি।

৮১

বাউল

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি-ভালোবাসা।

কী জাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
(এমন কোথা আর আছে গো!)
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ওই ভাষাতেই নিতাই-গোরা,
আনল দেশে ভক্তিধারা ;
(মরি হায় হায় রে!)
আছে কই এমন ভাষা,
এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা?

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন ;
(আরও কত মধুপ গো!)

ওই ফুলেরি মধুর রসে
বাঁধল সুখে মধুর বাসা!

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনল মালা জগৎ জিনে!
(গরব কোথায় রাখি গো!)

তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া-আসা।

ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাকনু মায়ে 'মা, মা' বলে ;
ওই ভাষাতেই বলব, হরি,
সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা!

৮২

মিশ্র খাম্বাজ

ভারত-ভানু কোথা লুকালে?
পুনঃ উদিবে কবে পুরব-ভালে?
হা রে বিধাতা! সে দেব-কান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে?

আছে অযোধ্যা—কোথা সে রাঘব!
আছে কুরুক্ষেত্র—কোথা সে পাণ্ডব!
আছে নৈরঞ্জনা—কোথা সে মুক্তি!
আছে নবদ্বীপ—কোথা সে ভক্তি!
আছে তপোবন—কোথা সে তপোধন!
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে!

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে ;
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে ;
কোথা সে বীরেন্দ্র সুর দানবারি ;
কোথা সে বিদুষী তাপসী নারী ;
সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা,
বীর্য বিড়ম্বিত খল কোলাহলে।

নানক-গৌরাঙ্গ শাক্যের জাতি,
নাহিকো সাম্য, ভেদে আত্মঘাতী ;
ধর্মের বেশে বিহরে অধর্মী!
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্মী?
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাত কালে?

৮৩

ভৈরবী

খাঁচার গান গাইব না আর খাঁচায় বসে ;
কণ্ঠ আমার রবে না আর পরের বশে।
সোনার শিকল দে রে খুলি,
দুয়ারখানি দে রে তুলি ;
বুকের জ্বালা যাব ভুলি
মেঘ-পরশে, শীতল মেঘের পরশে।

থাকবে নিচে ধরার ধূলি ;
ভুলব পরের বচনগুলি ;
বলব আবার আপন বুলি,
মন-হরষে, আপন মনের হরষে।

৮৪

মিশ্র দেশ

নূতন বরষ! নূতন বরষ!
তব অঞ্চলে ও কী ঢাকা?
মিলে নাই যাহা, হারিয়েছে যাহা,
তাই কি গোপনে রাখা?

দীনের লাগিয়া এনেছ কি দান?
ধনীর লাগিয়া এনেছ কি প্রাণ?
অলসের লাগি এনেছ কি শ্রম?
সুপ্তের লাগি জাগা?

আশায় বসিয়া আছেন জননী—
তাঁর লাগি তুমি কী এনেছ, ধনী?
ঘুচাবে কি তাঁর অতীতের পানে
সজল চাহিয়া থাকা?

আসিবে কি হেথা প্রেমের শাসন,
তুচ্ছের লাগি উচ্চ আসন?
শিখাবে কি দ্বেষ-গর্ব পাসরি
ভাই বলে ভাইয়ে ডাকা?

৮৫

মিশ্র বেহাগ

পরের শিকল ভাঙিস পরে, নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই,
আপন কারায় বদ্ধ তোরা, পরের কারায় বন্দী তাই।
হা রে মূর্খ! হারে অন্ধ!
ভাইয়ে-ভাইয়ে করিস দ্বন্দ্ব,
দেশের শক্তি করিস মন্দ,
(তোদের) তুচ্ছ করে তাই সবাই ;

সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই ;
(তাই) মন্দিরে-মসজিদে লড়াই,
প্রবেশ করে দেখ্ রে দু-ভাই,
—অন্দরে যে একজনাই

দেশ-মাতার আর বিশ্ব-মাতার,
ম্লেচ্ছ-কাফের এক পরিবার ;
নয় তুরস্ক, নয়কো তাতার,
জন্ম-মৃত্যু এই যে ঠাঁই।

ভিন্ন জাত আর ভিন্ন বংশ
এক জাতি তাই এক শো অংশ ;
হিন্দু রে, তুই হবি ধ্বংস,
না ঘুচালে এই বালাই।

ভাইকে ছুঁলে পদতলে
শুদ্ধ হোস তুই গঙ্গাজলে ;

ওরে সেই অচ্ছুত ছেলেই তুলে কোলে,
তুষ্ট হন যে গঙ্গা-মাঈ।
খাবিনে জল ভাইয়ের দেওয়া,
খাসনে অন্ন তাদের ছোঁওয়া,
ওরে, শবরীর আধ-খাওয়া মেওয়া,
রঘুনাথ তো খেলেন তাই!

তোরাই আবার সভাস্থলে,
হাঁকিস 'সাম্য' উচ্চরোলে,
সম-তন্ত্র চাস সকলে,
বিশ্ব-প্রেমের দিস দোহাই!

জাতির গলায় জাতের ফাঁস,
ধর্ম করছে ধর্মনাশ,
নিজের পায়ে পরলি পাশ,
দাসত্ব ঘোচে না তাই।

ছাড়্ দেখি রে রেষারেষি,
কর্ প্রাণে-প্রাণে মেশামেশি,
তখন তোদের সব বিদেশি
দাস না বলে বলবে ভাই।

৮৬

ভৈরবী

তাহারে ভুলিবে বলো কেমনে?
গাঁথা যে সে তব শত গানে,
যতনে।

কী হবে রুধিয়া দোর,
ভাঙা যে হৃদয় তোর,
মানিবে না মন-চোর
বাহিরের বারণে।

যাবি কোন্ দূর বিজনে
পাসরিতে সেইজনে?
সেথাও তো গাহে পাখি
কাননে।

সেথাও তো ফোটে ফুল,
বরষা বিরহাকুল,
সেথাও তো ওঠে চাঁদ
রজনীর গগনে।

৮৭

মিশ্র খাম্বাজ

কাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা, আমি পথের ভিখারি নহি গো।
শুধু তোমারি দুয়ারে অন্ধের মতো অন্তর পাতি রহি গো।

শুধু তব ধন করি আশ,
আমি পরিয়াছি দীন-বাস ;
শুধু তোমারি লাগিয়া গাহিয়া গান মর্মের কথা কহি গো।

মম সঞ্চিত পাপ-পুণ্য
দেখো, সকলি করেছি শূন্য ;
তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে, তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো।

৮৮

মিশ্র তিলোক কামোদ কীর্তন

জানি-জানি তোমারে গো রঙ্গরানী,
শূন্য করি লইবে মম চিত্তখানি।

এসো গো মম অন্তরে ধীরে মৃদু-মন্থরে
বিদ্যুৎ-প্রবেশে তব শঙ্কা মানি।

বলো গো অয়ি চঞ্চলে, এনেছ ও কী অঞ্চলে!
দিবে কি মোরে ভরিয়া দুটি পাণি?

তব চরণ-রন্‌ঝনা করিবে কি গো বঞ্চনা
কুহক-কল-কণ্ঠে এ কী বাণী (গায়)!

কী সুধা তব সংগীতে, কী শোভা তনু-ভঙ্গিতে
ভুলায় তব ইঙ্গিতে কী মোহ আনি!

৮৯

মিশ্র কানাংড়া

কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা?
কার লাগি এত উতলা?

কে তরী বাহি আসিবে গাহি?
খেলিবে তার সনে কী খেলা?

সারা বেলা গাঁথ মালা
ঘরের কাজে এ কী হেলা?

ছলনা করি আন গাগরি
কার লাগি বলো অবেলা?

৯০

খাম্বাজ

কে গো তুমি আসিলে অতিথি মম কুটিরে!
কবে যেন দেখেছি তোমারে আমি,
কুঞ্জ-কুসুম হাতে ফিরিতে যমুনা-তীরে।

ও দুটি নয়ন-মণি চিনি যে গো আমি চিনি,
কাজল মধুপ-ছায়া দেখেছি ফুল-শিশিরে।

জানি ও উজল হাসি, বিষাদ-তামস-নাশী,
দেখেছি বঙ্কিম ধনু, নীল-নীরদ-নীরে!

হৃদয়-মাধুরী তব কী অতুল অভিনব!
দেখিনি হেন বিভব, হৃদয় আসে না ফিরে!

আমার কুসুম-বীথি সফল করো, অতিথি ;
লহো পূজা নিতি-নিতি ভগন মনো-মন্দিরে!

৯১

মিশ্র মল্লার

বঁধু, এমন বাদলে তুমি কোথা?
আজ পড়িছে মনে মম কত কথা!

গিয়াছে রবি-শশী গগন ছাড়ি ;
বরষে বরষা বিরহ-বারি ;
আজিকে মন চায়, জানাতে তোমায়
হৃদয়ে-হৃদয়ে শত ব্যথা।

দমকে দামিনী বিকট হাসে ;
গরজে ঘন-ঘন, মরি যে ত্রাসে ;
এমন দিনে, হায়, ভয় নিবারি,
কাহার বাহু 'পরে রাখি মাথা?

৯২

কীর্তন

ঘন মেঘে ঢাকা সুহাসিনী রাকা,
তুমি কি গো সেই মানিনী ;
বাদল-নিঝরে শুধু মনে পড়ে
সে দুটি কাজল ঝরিণী।

এ ঘোর আঁধারে, সে খোঁজে তোমারে,
'এসো বঁধু' বলি ডাকে বারে-বারে ;
বিরহীর লাগি আছ কি গো জাগি,
কাটে কি কাঁদিয়া যামিনী?

ক্রুদ্ধ আকাশ, রুদ্ধ দুয়ার
তুমি কি গো তারই সেই মুখ-ভার?
সহসা বিজলি উঠিছে উজলি,
তুমি কি গো সেই দামিনী?

কাটি যাবে যবে বরষার রাত,
আসিবে হাসিয়া সোনার প্রভাত ;
তেমনি হাসিয়া, হৃদি বিলাসিয়া,
আসিয়ো মধুর-হাসিনী।

৯৩

খাম্বাজ

আজি স্বরগ-আবাস তুমি এসো ছাড়ি!
আজি বরষে বরষা বিরহ-বারি!

আজি ফুলে নাহিকো মধুগন্ধ,
মলয়ে নাহিকো মৃদু-মন্দ,
জীবনে নাহিকো গীত-ছন্দ,
তোমারে ছাড়ি!

মোর এ ভালোবাসা পাবে না নন্দনে,
উঠেনি এত সুধা সাগর-মন্থনে ;
না জানি, নিশি যাপ কতই ক্রন্দনে
আমারে ছাড়ি!

সেথায় নাহিকো আত্ম-বলিদান,
মিছে কলহ, মিছে অভিমান,
বিরহ-বেদন, বিরহ-অবসান,
—সেথা রবে কেমন করি?

৯৪

মিশ্র খাম্বাজ

আমার মনের ভগন দুয়ারে সহসা তুমি কে গো, তুমি কে?
নন্দন-আভা-বেষ্টিত তনু, উজল নিজ আলোকে!
তুমি কে গো, তুমি কে?

এ কী প্রেম-প্রতিম অঙ্গ!
এ কী যৌবন-রূপ-রঙ্গ!
এ কী মন্দাকিনী-মন্দ-সলিল-ভঙ্গ!
এ কী সহসা মম জীবন-বন পুষ্পিত,
তোমার নয়ন-পলকে!
তুমি কে গো, তুমি কে?

ছিল অশ্রুনন্দনলীন হৃদয় দুঃখ-তামস গগনে
আজি প্রাণ মম ইন্দ্রধনু তোমার নয়ন-কিরণে,
আজি প্রাণ মম মত্ত মধুপ, লুণ্ঠিত তব চরণে,
মম জীবন, মরণ, ধরম, শরম,
সকলি লীন পুলকে!
তুমি কে গো, তুমি কে?

তুমি বিশ্ব করেছ সুন্দর, মনের নিভৃত কন্দরে;
মম ক্ষুদ্র তরণী চঞ্চল ক্ষুদ্র জীবন-বন্দরে;
তুমি সহসা উদিত ভাস্কর নীল নিশীথ-অম্বরে;
মম জীবন-গহন-চয়ন-কুসুম
শোভিত তব অলকে!
তুমি কে গো, তুমি কে?

৯৫

মিশ্র দেশ-পিলু

চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে ?
উজল নয়নে কে গো হাসিলে ?
মোহন সুরে
ধীরে মধুরে
পরান-বীণায় কে গো বাজিলে ?

হেম-যমুনায়
প্রেম-তরী বায়,
(কে) ডাকে আমায়—আয় গো আয় ?
প্রভাত-বেলায়
সোনার ভেলায়
কেমনে চলে যাবে হায় !

তব সে কূলে,
যাবে কি ভুলে
যে-ভালোবাসা বাসিলে ?

৯৬

গজল

ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে ?
বলে দিল কে পথ এ কালো রাতে ?

এ যে কাঁটার বন, হেথা কী প্রলোভন,
ঘর ছেড়ে এলে কী আশাতে ?

মোর সাঁঝের গান, মোর করুণ তান,
শুনিলে কি তুমি দূর হতে ?

তব নয়নে জল, ফুলে-ভরা আঁচল
তুমি দিবে কি মোর সাথে ?

৯৭

পিলু বারোয়া

কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে!
হৃদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণনে!

কোয়েলা ডাকল আবার, যমুনায় লাগল জোয়ার ;
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর দুই নয়নে?

আজি মোর শূন্য ডালা, কী দিয়ে গাঁথব মালা?
কেন এই নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে!

হয় তুমি থামাও বাঁশি, নয় আমায় লও হে আসি-
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারিনে!

৯৮

মিশ্র বেহাগ

একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন-জলে,
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে?

যা ছিল কল্পমায়া, সে কি আজ ধরল কায়া?
কে আমার বিফল মালা পরিয়ে দিল তোমার গলে?

কেন মোর গানের ভেলায় এলে না প্রভাত-বেলায়!
হলে না সুখের সাথী জীবনের প্রথম দোলায়!

বুঝি মোর করুণ গানে ব্যথা তাঁর বাজল প্রাণে,
এলে কি দুকূল হতে কূল মেলাতে এ অকূলে?

৯৯

কালাংড়া

আমার মনের মন্দিরে এসো গো, নবীন বালিকা!
তব প্রথম প্রেম-প্রভাতে দেহো প্রথম প্রণয়-মালিকা।

এসো, প্রথম প্রেমে লজ্জিতা!
এসো, নবীন শরমে সজ্জিতা!
এসো, নবীন হরষে সজ্জিতা!
এসো নবীন-চন্দ্র-ভালিকা!

তব প্রথম প্রেমের আধো-আধো ভাষ,
প্রথম প্রেমের বাধো-বাধো আশ,
ক্ষণিক সাহস, ক্ষণিক ত্রাস,
আমারে করো সমর্পণ।

তব প্রথম প্রেম-স্বপনে,
তুমি আমারে দেখো গো গোপনে ;
তুমি আমারে তুষিতে পরো গো যতনে
অলকে যূথী-শেফালিকা।

১০০

ঝিঁঝিট

এসো গো ধনী, হৃদয়-কুঞ্জে,
—ডাকে বন-বিহারী।
প্রেম-নিকুঞ্জে মুরলী গুঞ্জে
রাধিকা-মন-হারী।

যমুনা-জল চল উচ্ছল,
গগনে ইন্দু পূর্ণ উজ্জ্বল,
আমার চিত্তে মধুর নৃত্যে
বাজে নূপুর তারই ;

ফুল-মন্দিরে, চলো সুন্দরী,
সকল শঙ্কা, লাজ সম্বরি,
তোমার লাগি সরব-ত্যাগী
চঞ্চল চিত-চারী।

১০১

মিশ্র পিলু

ওগো, আমার নবীন সাথী! ছিলে তুমি কোন্ বিমানে?
আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ওই করুণ গানে!

জগতের গহন বনে,
ছিনু আমি সংগোপনে,
না জানি কী লয়ে মনে
এলে উড়ে আমার পানে।

লয়ে তব মোহন বরন
আমার শুকনো ডালে রাখলে চরণ ;
আজ আমার জীবন-মরণ
কোথা আছে কে বা জানে!

ঝরে গেছে সকল আশা,
ফোটে না আর ভালোবাসা,
আজ তুমি বাঁধলে বাসা
আমার প্রাণে, কোন্ পরানে?

১০২

বারোয়া

মোর আজি গাঁথা হল না মালা,
পরের তোলা ফুলে ভরা ডালা।

তুলিব ফুল যত
আপন মনোমত,
যদিও কাঁটা শত
দিবে জ্বালা।

যদিও খুঁজিলে
চামেলি নাহি মিলে,
সাজাব বন-ফুলে
তার গলা।

একেলা তরু-ছায়
গাঁথিতে সে মালায়
যদিও বেলা যায়—
যাক বেলা।

১০৩

খাম্বাজ

আমার বাগানে এত ফুল, তবু কেন চলে যায়।
(তারা) চেয়ে আছে তারি পানে, সে তো নাহি ফিরে চায়!

ভুলে কি গিয়েছে ভোলা প্রভাতের ফুল তোলা,
জানে না কি পরিতে সে কুসুম গলায়?

আঁখির শিশির-পাতে ফুটেছে তারা প্রভাতে,
শুকাইয়ে যাবে তারা সাঁঝের বেলায়।

যবে সে আসিবে ফিরে নিশির ঘন তিমিরে
(তার) চরণ করিব রাঙা নিঠুর কাঁটায়।

১০৪

বেহাগ খাম্বাজ

শুধু একটি কথা কহিলে মোরে ;
না জানি, কহিলে তুমি কি মনে করে।
মনে করি সেই ভাষা
কখনো উপজে আশা,
কখনো নয়নে জল
প্রাণ শিহরে।

রচি তাহে কত তান,
কত গাথা, কত গান ;
কতবার সঁপি প্রাণ
তোমার করে।

১০৫

মিশ্র খাম্বাজ

আমায় ক্ষমা করিয়ো যদি তোমারে জাগায়ে থাকি
দু-দিন গাহিয়া গান চলিয়া যাইবে পাখি।

তোমার নিকুঞ্জ-শাখা,
বসন্ত-পবন-মাখা ;
প্রাণের কোকিলে, বলো, কেমনে ভুলায়ে রাখি?

নিঠুর সংসার-বনে
শুষ্ক তৃণ-আহরণে,
কাটি যাবে দিবা, তাই কাতরে তোমায় ডাকি।

আমার করুণ গানে,
যদি দুঃখ-স্মৃতি আনে,
ফুরাইয়া গেলে গান মুছিয়া ফেলিয়ো আঁখি।

১০৬

ভীমপলশ্রী

তুমি দাও গো দাও মোরে পরান ভরি দাও!
তখন নিয়ো গো নিয়ো যত তুমি চাও।

পথের অতিথি এসেছি পিপাসী,
কে তুমি বসিয়া পূর্ণ কলসি ;
মিটাও—মিটাও মোর পিপাসা মিটাও।

শূন্য আধারে এসেছি দুয়ারে,
দিবে কি ভরিয়া রতন-সম্ভারে?
ঘুচাও—ঘুচাও মোর দৈন্য ঘুচাও।

১০৭

সিন্ধু কাফি

মিনতি করি তব পায়,
তুমি যাও চলি তরী বাহি।

আমার কূলে,
এসো না ভুলে,
বেঁধো না হেথা তব তরী ;

তুমি তো বেলা হলে
যাবে বন্ধন খুলে ;
তবে কেন আসিছ গান গাহি?

তব তরণী-তরঙ্গ
করে কত রঙ্গ ;
রাখিতে নারি হৃদি ঢাকি ;

তুমি তো নিবে না মোরে
তোমার তরী পরে ;
তবে কেন ও মুখপানে চাহি?

১০৮

বাগেশ্রী

কার লাগি সজল আঁখি, ওগো সুহাসিনী?
হৃদয়ে তব, কি ব্যথা নব, ওগো হৃদয়-বিলাসিনী?

প্রভাত-ফুলে তারই হাসি দেখিয়া কি মন-উদাসী
দেখালো কি তার আঁখি নিঠুর নিশীথিনী।

অঙ্গনে বিহঙ্গ-গীতি তারই কি আহ্বান-স্মৃতি
কারে যাচি মৌন আজি ওগো সুভাষিণী?

১০৯

মিশ্র দেশ

ফিরায়ে দিয়েছ যারে, সেই তব বিনোদন!
বিরহে খুঁজিছ যারে—সে স্বপন, সে স্বপন!

যাহার সৌরভে মাতি ফিরিতেছ বনে-বনে';
যার লাগি শত কাঁটা বিঁধেছে তব চরণে ;
নব প্রেম-বিকশিত সে ফুল তোমারই মন!

যার লাগি প্রাণ-পণে সাজায়েছ আপনায় ;
যার লাগি মালা গাঁথা, চিনিলে না তারে হায়!
ভিখারির লাগি তুমি রচিয়াছ সিংহাসন।

১১০

ভৈরবী-ভেঁরো

তব অন্তর, এত মন্থর আগে তো তা জানিনি
ভেবেছিনু ফুটিবে ফুল শুনি পিক-রাগিণী।

মধুরাতে ফুলহাতে গান কি মোর শোননি,
কেন রাকা মেঘে ঢাকা ওগো অভিমানিনী?

তুমি যারে ভুলিবারে চাহিয়াও চাহনি,
সে তোমারে বারে-বারে চাহে দিন-যামিনী।

ধরা শেষে দিবে এসে তারে অনুরাগিণী
তবে কেন ধাও হেন ওগো বনহরিণী!

১১১

মিশ্র দেশ

সখা, দিয়ো না দিয়ো না মোরে এত ভালোবাসা ;
জগতে তা হলে মোর রবে না কিছুরই আশা!

তুমি দিলে সারা মন,
কী করিব আরাধন?
আসিয়ে তোমার দ্বারে পাব কি শুধু নিরাশা?

প্রতিদিন ফুল তুলে
যাইব তোমার কূলে ;
সেদিনের মতো শুধু মিটায়ো প্রেম-পিয়াসা।

লয়ে কোটি-কোটি কান,
যাব শুনিবারে গান ;
শরমে কহিয়ো মোরে একটি মরম-ভাষা।

আমার জীবন-নদী,
এত প্রেম পায় যদি,
ভাঙিয়া ভাসিয়া যাবে মোর স্বপনের বাসা।

১১২
কাফি

করুণ সুরে ও কী গান গাও?
বিষাদিনী ওগো, তুমি মিছে তারে চাও।

তুমি যারে চাও মনে,
সে তো নাহি এ ভুবনে ;
প্রেমের ভূষণে তারে মিছে সাজাও।
আশার ছলনে তুমি কেন দুঃখ পাও,
বিষাদিনী, কেন দুঃখ পাও?

এসেছ যাহার কাছে,
সে তো ভিখারি নিজে ;
ওগো ভিখারিনী, তুমি ঘরে ফিরে যাও ;
আপন বসনে তব নয়ন মুছাও ;
ভিখারিনী, নয়ন মুছাও।

১১৩
ভৈরবী

ওহে হৃদি-মন্দির-বাসী! আজি লও গো বিদায়,
যদি দীর্ঘ-সহবাসে
চঞ্চল হৃদি-পাশে
মম প্রেম-কুঞ্জ-সঞ্চিত ফুল-ডালা ম্লান হয়ে যায় ;
—আজি লও গো বিদায়।

তোমার নয়নে তিলেকও যদি হই পুরাতন ;
আহা, এমন সুধা-সিন্ধু,
যদি কমে যায় এক বিন্দু,
—তোমার আনন-ইন্দু নিতি দরশে, নিতি পরশে ;
—আজি লও গো বিদায়।

আমি তিক্ত বিরহ করিব পান আকুল মিলন-তিয়াষে
যদি সুখ-পীযূষ করি পান,
হয় সুখ-পিপাসা অবসান ;
যদি দেবতারে করি অপমান মনোমন্দিরে,
—আজি লও গো বিদায়।

১১৪

বেহাগ

আমি অলকে পরিতে পড়ে গেল মালা
তার পায়, ওগো, তার পায়!
আমি খেলিতে-খেলিতে ভুলে গেনু খেলা ;
এ কী দায়, ওগো, এ কী দায়!

আমি পুকুর ভাবিয়া দেছিনু সাঁতার ;
বুঝি নাই, ওগো, বুঝি নাই ;
শেষে দেখি এ যে অকূল-পাথার
যত যাই, ওগো, যত যাই!

আমি যত করি দান, ততোবার বলে,
আরো চাই, ওগো, আরো চাই,
শেষে আমার কুটিরে আমার লাগিয়া
নাহি ঠাঁই, ওগো, নাহি ঠাঁই।

১১৫

মিশ্র কালাংড়া

বঁধু! ধরো, ধরো মালা, পরো গলে,
ফিরে দিয়ো না বন-কুসুম বলে!

কাঁটার ঘায়ে রাঙা হাতে,
ফুল তুলেছি আঁধারে দুঃখ-রাতে ;
তাহে গেঁথেছি বিজনে আঁখি-জলে।

প্রেমের কূলে ছিনু একা,
আজি তোমারে একেলা পেনু দেখা ;
ঘর ভুলিনু তব বেণুর বোলে।

যদি না মালা শোভে গলে,
তারে দিয়ো ঠাঁই তব পদতলে ;
তোমায় ধরিব হৃদয়-শতদলে।

১১৬

লউনি

কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া!
এসেছ কি হেথা তুমি পথ তব ভুলিয়া?

তোমার লাগিয়া আজ,
পরিনি মিলন-সাজ ;
বিরহ-শয়নে ছিনু আঁখি ছলছলিয়া ;
কে জানিত ছিল মোর দোরখানি লিয়া!

ধরিব তোমার কর,
দাঁড়াও, পথিকবর!
গেঁথে নি, কুসুম-মালা তুলি প্রেম-কলিয়া ;
না হইতে মালা গাঁথা যেয়োনাকো চলিয়া!

১১৭

গুজরাটি খাম্বাজ

তুমি মধুর অঙ্গে, নাচো গো রঙ্গে, নূপুরভঙ্গে হৃদয়ে
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনিনি !

প্রেম-অধীরা,
কণ্ঠ-মদিরা,
পরান-পাত্রে এ মধু রাত্রে ঢালো গো!
নয়নে, চরণে, বসনে, ভূষণে গাহো গো,
মোহন রাগ-রাগিণী!
ওগো নব-অনুরাগিণী!

মম শোণিত-স্রোতে বহিবে গান,
লহরে-লহরে উঠিবে তান ;
শিহরি উঠিবে অবশ প্রাণ ;
—রিনি রিণি রিণি রিণিনি!

শুনি তব পদ-গুঞ্জন, জগত-শ্রবণ-রঞ্জন,
আপন হরষে,
আপন পরশে,
তব চরণ-মন্ত্র পরান-যন্ত্রে বাজিবে ;
সুখ-স্মৃতিগুলি আমারে ঘিরিয়া নাচিবে,
রিণিকি-রিণিকি-রিণি-রিণি!
ওগো, পরান-বিলাসিনী।

১১৮

টোড়ি

আমি বসে আছি তব দ্বারে ;
কত যে ডাকি বারে-বারে।

দেখো, বিরহী বিহগ করুণ গাইল,
কুসুমে সাজি অরুণ আইল ;
—দুয়ার খোলো, লহো আমারে!

এসেছি হেথা অনেক ঘুরে,
যাইতে হবে অনেক দূরে ;
পথের অতিথি চাহে তোমারে!

এসেছি হেথা তোমার তরে,
চরণে বেদনা, কুসুম-করে ;
এ বন-মালা দিব কাহারে?

১১৯

লগ্নী

কে গো গাহিলে পথে এসো পথে বলিয়া,
দুয়ার খুলিনু যবে কেন গেলে চলিয়া?

বিজন বরষা-রাত,
এ কী ছলনা, নাথ!
আঁধারে মিলালে তুমি বারেক উজলিয়া!

ঝড়ের বাতাসে আর
রুধিতে পারি না দ্বার ;
পথে ঝড়, ঘরে ডর, হাতে প্রেম-ফুলহার!

শ্রবণে মিলাল গান,
হৃদয়ে রহিল তান ;
তোমার লাগিয়া আঁখি উঠিছে উথলিয়া!

১২০

সিন্ধু কাফি

হে পান্থ, বারেক ফিরে চাও মম মুখপানে।
—মনে হয়, চলিয়াছ আমারি সন্ধানে।

আমিও যে বসে আছি সে পথিক লাগি
যারে লয়ে হব আমি সরব-ত্যেয়াগী ,
হে তৃষ্ণ, হে শ্রান্ত, তুমি কেন গেলে চলে?
দেখনি কি ভরা কুম্ভ মম তরুতলে?
হেন অন্যমনা তুমি কাহার ধেয়ানে?

তোমার দু-হাতে মম হাতখানি তোলো,
দেখো তো হৃদয়ে তব দেয় কি না দোল!
মম সুধাপাত্রখানি উঠাও অধরে,
দেখো তো প্রেমের ক্ষুধা হরে কি না হরে ;
তারপর যেয়ো চলে যদি মন মানে।

১২১

সিন্ধু কাওয়ালি

মন হরে কে পালাল গো?
—তারে ধরো।

যখন আছিনু ঘুমে,
নীরবে নয়ন চুমে,
পরাইয়া গেল সে গোপনে
আপন কণ্ঠমাল গো!
—তারে ধরো!

না জানি কেমন ভোলা,
দেখেনি দুয়ার খোলা,
সিঁদ কাটি পশি গৃহে
মোর নয়ন বাঁধিল গো!

বুঝি এসেছিল, হায়,
মোর নয়ন-দুলাল গো!
—তারে ধরো।

১২২

কীর্তন

মম মনের বিজনে আমি মিলিব তব সনে;
জাগরণে যদি পথ নাহি পাও, (তুমি) আসিয়ো স্বপনে।

আমি যাব না, তব কুঞ্জ-কুটিরে যাব না;
আমি চাব না, তব সাধের মালাটি চাব না;
আমি কব না, তোমারে মনের কথাটি কব না,
মনোব্যথা রবে মনে।

এ দুঃখ-পাথারে সুখের ভেলায় ভাসিয়ো;
এ ভবের মেলায় প্রমোদ-খেলায় হাসিয়ো;
কণ্টক যদি চরণে লাগে, আসিয়ো,
আমি তুলিব সযতনে।

১২৩

ভৈরবী

ওগো, সুখ নাহি চাই ;
তোমার পরান-পাশে দিয়ো মোরে ঠাঁই।

তুমি যদি থাক সুখে,
আমারে রাখিয়ো সুখে ;
তুমি যদি পাও দুঃখ
যেন দুঃখ পাই।

নাহি বুঝি কান্না-হাসি,
দারিদ্র্য-সম্পদরাশি ;
তোমা ছাড়া সুখ-দুঃখ
সকলি বালাই।

১২৪

ভৈরবী

বলো সখী, মোরে বলো, বলো,
কেন গো নয়ন ছল-ছল?

এমন প্রাতে ধরি দু-হাতে,
চেয়েছে কি কেহ ঢল-ঢল?

কাহারো বাঁশি, মোহন-ভাষী,
ডেকেছে কি—বধূ, চলো, চলো?

তোমার মালা পরিয়ে গলে
চলে গেছে কি হাসিয়ে খল-খল?

ভাঙিব বাঁশি, সরব-নাশী ;
চলো ফিরে, ঘরে চলো, চলো।

১২৫

কালাংড়া

বঁধু, ক্ষণিকের দেখা তবু তোমারে ভুলিতে পারে না আঁখি ;
বহুদিন হতে যেন জানা শোনা, দেখা শুধু ছিল বাকি।

আমি খুঁজিয়াছি সব ধরা,
তবু তোমার পাইনি সাড়া ;
হায়, অন্তরে মোর আছিলে লুকায়ে
নয়নেরে দিয়ে ফাঁকি!

যত আধ-গাঁথা জুঁই-বেলি,
শরমে দিয়েছি ফেলি,
সে ফুল তোমার মালায়-মালায়
কণ্ঠে রয়েছে ঢাকি!

১২৬

খাম্বাজ

বলো গো সজনী, কেমনে ভুলিব তোমায়?
যতন যাতনা বাড়ায়।

যদিও যাতনা সহি,
নয়ন ফিরায়ে লহি,
প্রাণ তবু পড়ে থাকে পায়।

না জানি কী আছে মধু
তোমার পরানে বঁধু,
প্রাণ সদা তোমা-পানে ধায়!

১২৭

দেশ (ঘন-ঘটার সুর)

ভুলো না জীবনমণি, ভুলো না আমায় ;
আমি ধূলিকণা হয়ে রব তব পায়।
নিঠুর প্রাণে মোরে দিয়ো না বিদায়।

এনেছি অধর ভরি শত-শত চুম্বন ;
এনেছি হৃদয় ভরি শত-শত কম্পন ;
রচেছি তোমার লাগি শত-শত বন্ধন ;
আমি অন্ধ তোমার তৃষায়।

সুখ-প্রভাতে মোরে করিয়ো না সাথী,
রাখিয়ো সাথে শুধু দুঃখের রাতি ;
জীবন-শশীর তুমি তপন-ভাতি ;
আমি সুন্দর তোমার বিভায়।

১২৮*

ঝাঁপতাল

কেন দেখা দিলে যদি দেখা নাহি দিবে আর?
কেন গো জাগালে প্রেম পরানে আমার?

পশিয়া এ অন্তরের অন্তঃপুরে
কেন গো ডাকিলে মোরে মোহন সুরে?
চলিয়া যাইবে যদি ফেলিয়ে দূরে,
কেন গো ভাঙিলে তবে শরম আমার?

তোমার দেশের আমি নাহি জানি পথ ;
কোথা গেলে, হায়, মম পুরে মনোরথ?

পরাইয়া ফুলদল আমার কেশে,
চাহিয়া আমার পানে মধুর হেসে,
করিয়াছ বিদেশিনী আপন দেশে ;
কেমনে হইব পার এ বিরহ অপার?

* কবির জীবদ্দশায় ১৯৩১ সংস্করণ গীতিগুঞ্জে এটি ১২৭ সংখ্যক কবিতার অংশ।

১২৯

বেহাগ-খাম্বাজ

আমি তাই ছাড়িতে সদা ভয় পাই ;
তুমি থাকিলে কাছে লোক-লাজ নাই।

যখন তোমারে দেখি,
আপনারে ভুলে থাকি ;
নয়ন মুদিলে পাছে তোমারে হারাই।

তুমি যবে যাও ছাড়ি,
আপনারি ভয়ে মরি,
তোমা বিনা এ জগতে সকলি বালাই।

১৩০*

ভৈরবী

যাও-যাও, জ্বালাতে এসো না ভালোবাসা ;
চাহি না বরষ পরে বারেক আসা।

প্রভাতে মালতী-যূথি-করবী,
অলি-কুল-গুঞ্জনে গরবী ;
আমা হতে সুন্দরী, সুরভি,
যাও, তার সনে করো খেলা-হাসা ;
যাও যাও, জ্বালাতে এসো না ভালোবাসা।

নিশীথে কলঙ্কিনী আকাশে,
আমা হতে উজ্জ্বল বিকাশে ;
যাও তুমি সে রূপসী-সকাশে
মিটাও তোমার রূপ-আশা ;
যাও যাও, জ্বালাতে এসো না ভালোবাসা।

কোকিলের মতো কণ্ঠ নাহি,
যে মোহন সুরে আমি তোমারে চাহি ;

কবির জীবদ্দশায় ১৯৩১ সংস্করণ গীতিগুঞ্জে এটি ১২৯ সংখ্যক কবিতার অংশ।

আমি কি পারি তুষিতে তোমারে গাহি
নিতি-নিতি নব-নব ভাষা!
যাও, যাও, জানাতে এসো না ভালোবাসা।

১৩১

কীর্তন

আমি কী দেখিব তোমায় হে!
তোমার সকলি সুন্দর হে—অতি সুন্দর!
তব চরণ সুন্দর, বরন সুন্দর, সুন্দর তব নয়ন ;
তুমি দাঁড়ায়ে সুন্দর, বসিয়া সুন্দর, সুন্দর তব শয়ন ;
তব গমন সুন্দর, থমক সুন্দর, সুন্দর তব আলস ;
তব গরব সুন্দর, অশ্রু সুন্দর, সুন্দর হাসি-বিকাশ ;
তব রচন সুন্দর, বচন সুন্দর, সুন্দর তব গীতি ;
তব মরম সুন্দর, শরম সুন্দর, সুন্দর তব ভীতি।

আমি কত দেখিব তোমায় হে?
তুমি সকল সময়ে মধুর—অতি মধুর!
তুমি দিবসে মধুর, নিশীথে মধুর, মধুর তুমি স্বপনে ;
তুমি সজনে মধুর, বিজনে মধুর, মধুর তুমি গোপনে ;
তুমি বিপদে মধুর, বিষাদে মধুর, মধুর যবে ভরসা ;
তুমি শরতে মধুর, হরষে মধুর, মধুর যবে বরষা ;
তুমি সোহাগে মধুর, কলহে মধুর, মধুর যবে অভিমান ;
তুমি মিলনে মধুর, বিরহে মধুর, মধুর যবে ভাঙা প্রাণ!

তুমি মধুর হে যবে আমায় ভালোবাসো, মধুর যবে বাসো অন্যে ;
তুমি মধুর যবে বসো কনক-আসনে, আমার কাটে দিন দৈন্যে!

১৩২

সিন্ধু

তোমার নয়ন-পাতে ঘুচিয়া গিয়াছে নিশা ;
জীবন-বিজনে তাই আজি পাইয়াছি দিশা।

তোমার অন্তর-মাঝে,
না জানি কী মধু আছে ;
চারিদিকে মরুভূমি, তবুও নাহিকো তৃষা।

মথিয়া আশার জল,
উঠেছে যে হলাহল,
আজি সেই তিক্ত বিষ মধুর পীযূষে মিশা।

১৩৩

কীর্তন

তাই ভালো, দেবী, স্বপনেই তুমি এসো ;
যদি না বসিবে জীবন-আসনে, পরান-আসনে বোসো।

জটিল, পঙ্কিল জগতের পথে,
কেমনে আসিবে নন্দন-রথে?
স্বরগ হইতে স্বপনের পথে অলখিতে তুমি এসো।

যে দু-দিন তুমি ছিলে দেহ-পুরে,
নিকটে থেকেও ছিলে বহুদূরে ;
আজি দু-জনার কত ব্যবধান তবু দূর নাহি লেশ।

মরতের গেহ, মরতের স্নেহ,
চঞ্চল অতি, অতি পরিমেয় ;
যে ভালোবাসা বাসে নাই কেহ, সেই ভালোবাসা বেসো।

ভবের বন্ধনে পড়িলে না বাঁধা,
তাই না জানিলে বৃথা হাসা-কাঁদা ;
স্বপনবাসিনী, ওগো সুহাসিনী, ওই হাসি তুমি হেসো।

১৩৪

গজল

রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা?
রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আঁকা।
তোলা ফুলের খালি বোঁটায় ছোঁয়ার গন্ধ মাখা!

ভেবেছিলাম ভোরে উঠে ভরব ফুল-ডালা,
কারও পায়ে দিব অর্ঘ, কারও গলায় মালা ;
কোথা হতে এল রে চোর সকল চোরের আলা।

ছেঁড়া পাপড়ি ধরে-ধরে গেলাম বহু দূরে,
পথের মাঝে পথ হারিয়ে ঘরে এলাম ঘুরে ;
কে জানে রে সে অজানা কোন্ অজানা পুরে ?

দেখেছ কি সে চোরারে, শুধাই সবারে ;
কেউ বা বলে খোঁজো তারে বনের মাঝারে ;
কেউ-বা বলে পাবে তারে নদীর ও-পারে।

চাইত যদি দোরে এসে আমার কুসুমগুলি,
উজাড় করে দিতাম তারে আপন হাতে তুলি !
পারত কি চলে যেতে—আমায় যেতে ভুলি ?

১৩৫

ভৈরবী

নিজেরে লুকাতে পারিনি বলে লাজে হইনু সারা ;
মোর প্রাণের রুদ্ধ গুপ্ত প্রেমের কেমনে পাইলে সাড়া ?

যখন কথাটি কহিতে, শুনেও শুনিনি কানে ;
যখন গানটি গাহিতে, চাহিনি তোমার পানে ;
নয়নে আসিলে জল হাসিতাম নানা ভানে ;
শত যতনের অযতনে পাড়নু কি শেষে ধরা ?

দেখিতাম যবে স্বপনে, সত্য কি তুমি আসিতে ?
আমার নীরব নিশীথে, সত্য কি তুমি ভাসিতে ?
আমার প্রভাত-কুসুমে, সত্য কি তুমি হাসিতে ?
ছিলে কি সতত লুকায়ে নয়নে হইয়ে নয়ন-তারা ?

চাহি নাই তব দান, দিলেও দিয়েছি ফিরায়ে ;
তুমি ফেলিয়া যাইতে যাহা, গোপনে লয়েছি কুড়ায়ে ;
তব মূর্তি করিনি পূজা, স্মৃতিই রয়েছি জড়ায়ে,—
কেমনে জানিলে তুমি যে আমার সকল জগত-জোড়া ?

১৩৬

সিন্ধু কাফি

ওহে সুন্দর, যদি ভালো না বাসো তবে যাও,—
যদি কভু দুঃখ পাও, তবে আসিয়ো।
তোমারি নয়ন-তরে রহিল অঞ্চল মম, আসিয়ো।

পুষ্পে তোমারে করিব আঘ্রাণ, তারকা-কিরণে হেরিব,
বসন্ত-বাতাসে করিব পরশ, ভ্রমর-গুঞ্জনে শুনিব ;
আমি তোমা দিয়ে করি জগত রচনা, তোমাতেই সদা রহিব।

তুমি আমারি প্রেমে হইবে অসীম,
যেথা যেতে চাও, যাইয়ো ;
যদি কভু দুঃখ পাও, তবে আসিয়ো,
ওহে সুন্দর, আসিয়ো!

১৩৭

আশাবরী

মুরলী কাঁদে—রাধে-রাধে বলে,
শ্যামসুন্দর, হায়, ভাসে নয়নজলে।

দেখো যমুনা-জলে, শূন্য তরী দোলে ;
শূন্য ঝোলে ঝুলা নীপ-তরু-তলে ;
—'রাধে-রাধে' বলে।

কুঞ্জে নীরব পাখি, পুচ্ছ মেলে না শিখী,
পবন থাকি-থাকি দীরঘ নিশাস ফেলে!
এসো গো মানিনী, মাধো-বিমোহিনী,
এসো বিরহিণী, এসো বঁধু গলে ;
—শ্যাম-শ্যাম বলে।

১৩৮

বেহাগ

আপন কাজে অচল হলে
চলবে না রে চলবে না।
অলস স্তুতি-গানে তাঁর আসন
টলবে না রে টলবে না।

হল যদি তোর না হয় সচল,
বিফল হবে জলদ-জল ;
উষর ভূমে সোনার ফসল
ফলবে না রে ফলবে না।

সবাই আগে যায় রে চলে ;
বসে আছিস তুই কী বলে?
নোঙর বেঁধে স্রোতের জলে,
(তরী তোর) চলবে না রে চলবে না।

তীরের বাঁধন দে রে খুলি,
চলে যা তুই পালটি তুলি ;
দিক যদি তুই না যাস ভুলি
(তরী তোর) তলবে না রে তলবে না।
(বিধি তোরে) ছলবে না রে ছলবে না।

১৩৯

বাউল

নিচুর কাছে হতে নিচু শিখলি না রে মন!
সুখী জনের করিস পূজা, দুখীর অযতন! (মূঢ় মন!)

লাগেনি যার পায়ে ধূলি, কী নিবি তার চরণ-ধূলি?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন! (মূঢ় মন!)

প্রেম-ধন মায়ের মতন, দুঃখী-সুতেই অধিক যতন ;
এই ধনেতে ধনী যে জন সেই তো মহাজন! (মূঢ় মন!)

বৃথা তোর কৃচ্ছ্রসাধন ; সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন।
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ! (মূঢ় মন!)

মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস ভুলে সরল সত্য ;
—সকল ঘরে সকল নরে আছেন নারায়ণ! (মূঢ় মন!)

১৪০

সিন্ধু

আপনার হিত ভেবে-ভেবে দিন কাটালি, মূঢ়মতি ;
তোর নিয়মে বাঁধা কি রে জগবন্ধু জগপতি?

নিজের ভাবনা ভাবলি যত,
ভাবনার ভার বাড়ল ততো ;
ভাঙল আশা শত-শত,
তবু আশার নাই বিরতি?

সাগর সাজায় শৈলের শির,
শৈল দেয় নিজ বুকের নীর ;
শিষ্য হয়ে প্রকৃতির,
শেখ্ রে পরের অনুগতি।

বসে আপন বদ্ধ ঘরে,
কাঁদলি কত নিজের তরে ;
দু-ফোঁটা জল দে রে পরে,
যারা দীন-দুঃখী অতি।

থাকবি যদি নিজের কাজে,
কেন এলি সবার মাঝে?
আয় রে সেজে দাসের সাজে,
সবার-পায়ে কর্ প্রণতি!

১৪১

মিশ্র খাম্বাজ

যাহারে দেখতে নারি, তারেই আমি চাই গো,
যাহারে ধরতে চাহি, তারেই নাহি পাই গো!

খেলি এ মাটির খেলা,
হরষে গেল বেলা,
নয়নে বারি তবু—কী যেন কী নাই গো।

গোপনে চিত্তে বসি
কে যেন বাজায় বাঁশি ;
মনে হয় আমার 'কালা', আমি তাহার 'রাই' গো!

বুঝি সে আঁধার রাতে
সহসা ধরবে হাতে ;
তাই আমি মালা হাতে আঁধার-পানে ধাই গো!

১৪২

রামায়ণী

যতই গড়ি সাধের তরী, যতই করি আশা,
এক তুফানে ডুবায় তারে, এমন সর্বনাশা,
সে এমন সর্বনাশা!

আবার যখন আঁধার রাতে কূলের পাই না দিশা,
হালটি আমার লয় গো কেড়ে, এমন ভালোবাসা,
তার এমন ভালোবাসা!

সাগর-মাঝে প্রলয় নাচে হুহুংকারে ধায় ;
অন্তরের অগ্নি-ক্রোধে বিশ্বেরে নাচায়,
সে বিশ্বেরে নাচায়!

আবার, ভোরের পুবে নিশির নভে এমন চাওয়া চায়!
তরুর ডালে শিশুর গলে এমন গাওয়া গায়,
সে এমন গাওয়া গায়!

কখনো কাঁদায়, কখনো হাসায়, কখনো যে গো মারে ;
এই পাগলের লীলা বলো বুঝতে কে-বা পারে!
তারে বুঝতে কে-বা পারে?

যখন থাকি ঘুমের ঘোরে (আমার) সকল বিভব হরে
তবু আমার পরান পাগল ওই পাগলের তরে,
হায়, ওই পাগলের তরে!

১৪৩

ভৈরবী

সবারে বাস্ রে ভালো ;
নইলে (মনের) কালো ঘুচবে না রে!
আছে তোর যাহা ভালো,
ফুলের মতো দে সবারে।

করি তুই আপন-আপন,
হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে-তারে।

যারে তুই ভাবিস ফণী,
তারো মাথায় আছে মণি ;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি
—ভবের বনে ভয় বা কারে?

সবাই যে তোর মায়ের ছেলে ;
রাখবি কারে, কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ও-পারে।

১৪৪

বাউল

ভালোবাসা কত পাবি আর, হা রে খ্যাপা!
যেখানে তুই থাক্ রে ভোলা, পরিস গলে হার, রে খ্যাপা!

শূন্য যে তোর পর্ণ-গেহ, (হা রে কাঙাল, হা রে কাঙাল!)
তবু পাস তুই পরম স্নেহ ;
হা অভাগা, কী দিবি তুই তাদের উপহার, রে খ্যাপা!

যখন যাস তুই ফুলের পাশে, (ওরে খ্যাপা!)
ওরে, তারাও তোরে ভালোবাসে,
আকাশ ভরে তারা হাসে, তোর ঘুচায় দুঃখ-ভার, রে খ্যাপা।

যারা এত দিচ্ছে তোরে, (হা রে কাঙাল, হা রে কাঙাল!)
বসা ছিন্ন প্রাণের 'পরে ;
আর কিছু তোর নাই রে কাঙাল, তুই খুলে দে দুয়ার, রে খ্যাপা!

কতদিন বা রইবি ভবে, (হা রে ভোলা!)
এত ঋণ তুই শুধবি কবে?
তোর দিনে-দিনে বাড়ছে বেলা, বাড়ছে প্রেমের ধার, রে খ্যাপা!

পারের কড়ি চাইবি যবে, (হা রে কাঙাল, হা রে কাঙাল!)
পরের কড়ি দিস রে তবে ;
হোস রে পরের দেওয়া ধনে বৈতরণী পার, রে খ্যাপা!

১৪৫

ভৈরবী

পাগলা! মনটারে তুই বাঁধ্ ;
কেন রে তুই যেথা-সেথা পরিস প্রাণে ফাঁদ?

শীতল বায়ে আসলে নিশি,
তুই কেন রে হোস উদাসী?
(ওরে) নীলাকাশে অমন করে হেসেই থাকে চাঁদ!

শৈল-শিরে সোনার খেলা,
দেখিস যবে প্রভাত-বেলা,
তুই কেন রে হোস উতলা দেখে মোহন-ছাঁদ!

করুণ সুরে গাইলে পাখি,
তোর কেন রে ঝরে আঁখি?
কবে তুই মুছবি নয়ন, ঘুচবে মনের ধাঁধ?

সংসারেতে উঠলে হাসি,
তুই শুনিস রে ব্রজের বাঁশি।
(ওরে) ভাবিস কি রে সবই গোকুল, সবই কালাচাঁদ?

কতই পেলি ভালোবাসা,
তবু না তোর মেটে আশা!
এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভরে কাঁদ্!

১৪৬

বাউল

তোরা জাগাস না লো পাগলারে!
সে যে পড়ে আছে, থাক্ পড়ে পথের ধারে!

ও সে সুদূর গানে, বঁধুর পানে ছুটেছিল আঁধারে ;
মানে নি জোয়ার-ভাঁটা, বনের কাঁটা সঙ্গী-বিহীন সংসারে।

সে মোহন-পাখি দেছে ফাঁকি কাঁটা-বনের মাঝারে ;
তাই লোহিত গায়ে, ক্লান্ত হয়ে, চাহে যেন কাহারে!

ঘুমে আছে ভালো, জাগাস না লো, গাওয়াস না লো তাহারে
তার গোপন কথা প্রাণের ব্যথা করুণ গানে গাঁথা রে।

আজ তার নাইকো কড়ি, নাইকো তরী, ডাক শুনেছে ও-পারে
চায় সে হইতে পার অকূল পাথার বক্ষ-ভাঙা সাঁতারে।

ওলো এমন ভোলায় কাজ কী তোলায়, থাক্ শুয়ে ধূলি-পরে ;
কহি সুখের ভাষা দিসনে আশা এমন সর্বনাশারে।

১৪৭

বাউল কীর্তন

যদি তোর হৃদ্-যমুনা হল রে উছল, রে ভোলা!
তবে তুই এ কূল ও কূল ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা।

আজি তুই ভরা প্রাণে, ছুটে যা নৃত্যে-গানে ;
যে আসে প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা!

যে আসে মনের দুখে, যে আসে ফুল্ল মুখে,
টেনে নে সবায় বুকে, তোর থাক-না চোখে জল, রে ভোলা!

দু-ধারে ফুল কুড়িয়ে, চলে যা মন জুড়িয়ে ;
মালা তোর হলে বিফল, করবি কী তুই বল্, রে ভোলা!

মিছে তোর সুখের ডালি, মিছে তোর দুখের কালি ;
দু-দিনের কান্না-হাসি, ছল, ছল, ছল, রে ভোলা।

জীবনের হাটে আসি, বাজা তুই বাজা বাঁশি,
থাক্ না সেথা বেচা কেনার দারুণ কোলাহল, রে ভোলা!

অরূপের রূপের খেলা, চুপ করে তুই দেখ্ দু-বেলা ;
কাছে তোর এলে কুরূপ, —তুই মুখ ফিরিয়ে চল্, রে ভোলা!

১৪৮

ভৈরবী

ভোল্ রে ভোলা, ভোল্।
ভুলে যা কাঁটার ব্যথা,
ফুলগুলি তুই তোল্।

কে গেল ছলন করে
কে গেল দলন করে
এখনও তাই ভেবে কি,
চিত্তে দিবে দোল্।
ভোল্ রে ভোলা, ভোল্।

যে তোরে খুঁজি-খুঁজি,
হরে লয় সকল পুঁজি,
তারে তুই বন্ধু জেনে,
অঙ্গে দে রে কোল।

দাঁড়া তুই সবার পিছু,
যে নিচু সেই তো উঁচু,
ভুলে যা দশের নিন্দা,
যশের উচ্চ রোল।
ভোল্ রে ভোলা, ভোল্।

কুরূপের তীক্ষ্ণ বাণে,
যদি তোর হৃদয় হানে,
চেয়ে দেখ্ নিশীথিনীর
নয়ন সুনিটোল।

আছে তোর গানের তরী,
আছে তোর প্রেমের হরি,
ভুলে যা ঝড়ের বাধা,
খোল্ রে নোঙর খোল্।
ভোল্ রে ভোলা, ভোল্।

১৪৯

বাউল

ভোলা, তুই তাঁর চরণে মাথা ঠেকা।
—এবার তুই অনেক দিনে পেলি দেখা।

কঠিনে হৃদয় পিষে, নয়নের জলে মিশে,
যে চন্দন পেলি রে তুই, ওরে একা!
আজি তুই সে চন্দনে পর্ কপালে টিপের রেখা।

হয়তো পুঁজি হবে খালি, শূন্য হবে যশের থালি,
করিস নে ভয়, তাই হবে, যা আছে লিখা।
শুধু তুই রাখ জ্বালিয়ে প্রাণের কোণে প্রেমের শিখা।

সকল ব্যথা তুচ্ছ করে, রাঙা চরণ থাকিস ধরে
দুখের মাঝেই পাবি রে তুই সুখের দেখা ;
সেই দেখাতেই হবে রে তোর সকল শেখা।
ভোলা, তুই তাঁর চরণে মাথা ঠেকা।

১৫০

ভৈরবী

আবার তুই বাঁধবি বাসা কোন্ সাহসে?
আশা কি আছে বাকি হৃদয়-কোষে!

কতবার গড়লি রে ঘর,
কতবার এল রে ঝড়,
কতবার ঘরের বাঁধন পড়ল খসে।

বাহিরের মুক্ত মাঠে
যেন তোর জীবন কাটে।
কেন তুই ক্ষুদ্র বাটে থাকবি বসে?

সবারে কর্ রে আপন,
হ রে তুই সবার আপন,
ভুলে যা দুখের দাহন,
ডুব দিয়ে গান-সুধার রসে।

১৫১

পিলু মিশ্র

ও গো দুঃখী, কাঁদিছ কি সুখ লাগি?
সুখের যাতনা জান না কি?

কুসুম দু-দিনে শুকায়ে যায়,
থাকে শুধু কাঁটা তার বোঁটায়;
থাকে কেতকী-বনে ফণী জাগি।

মিলনে সদাই বিরহ-ভয়,
সে জয়ী, যে-জন বেদন সয়;

দুখের দাহনে হও অমল,
মুছাও দুঃখীর আঁখির জল;
পেতে যদি চাও,—হও ত্যাগী।

১৫২

মিশ্র সিন্ধু খাম্বাজ

থাকিস নে বসে তোরা সুদিন আসবে বলে ;
কারো দিন যায় হরষে, যায় কারো বিফলে।

সুখের ছদ্মবেশে,
আসে দুঃখ হেসে-হেসে,
জীবনের প্রমোদ-বনে ভাসায় আঁখি-জলে।

যেথা আজ শুষ্ক মরু,
যেথা নাই ছায়া-তরু,
হয়তো তোদের নয়ন-জলে ভরবে ফুলে-ফলে।

জীবনের সন্ধি-পথে
খুঁজে পথ হবে নিতে ;
কেউ জানে না কোথায় যাবি, কেউ দিবে না বলে।

ভাঙিলে বালির আবাস,
বিষাদে হোসনে হতাশ,
আছে ঠাঁই, বলে বাতুল, রাতুল-চরণ-তলে।

১৫৩

ইমন কল্যাণ

নমো বাণী বীণাপাণি, জগত-চিত্ত-সম্মোহিনী!
নমো বাদ-সংগীত-মাতঃ, ভারতী ভবতারিণী!

সৌরলোক গীত-চালিত, দ্যুলোক-ভূলোক গীত-মুখরিত
ষড়্ঋতু ষড়রাগরঞ্জিত—বন্দে চরণে বন্দিনী।

সুপ্ত স্মৃতি পুনঃজীবিত, শান্ত-তৃপ্ত তাপিত চিত,
সুখীজন সদা নন্দিত—তব সংগীত-ছন্দে।

প্রেমমুখর মুরলী-রন্ধ্র, সমরে ডমরু মরণমন্দ্র,
গীত আদি-বেদ-মন্ত্র—তব সংগীত-ছন্দে ;
নমো ঈশ্বরনন্দিনী!

১৫৪

কাফি

এসো প্রবাস-মন্দিরে,
এসো গো বঙ্গ-ভারতী!
দীন-প্রবাসী বঙ্গজনের
লহো গো দীন আরতি।

যতনে তুলিয়া প্রবাস-ফুল
পূজিত তোমার চরণ-মূল ;
আসিবে নূতন ভকত-কুল,
করিবে চরণে প্রণতি।

তোমার বীণার মোহন তান
মোহিবে নিখিল ভারত-প্রাণ,
গৌড়জনের গৌরব-মান
লভিবে নবীন শকতি।

সুজলা, সুফলা, ও গো শ্যামা!
ওগো বাঙালি-হৃদি-রমা!
ভোলেনি তোমায় ভোলেনি, মা,
তোমার প্রবাসী-সন্ততি।

১৫৫

মিশ্র

থাকো সুখে, তুমি থাকো সুখে, তুমি থাকো সুখে।
তাঁর অভয় চরণ রাখো বুকে—থাকো সুখে, থাকো সুখে।

কাটো দিবস-যামিনী, সবার হিতকামিনী,
সে পদ-অনুগামিনী,—সুখে-দুখে, থাকো সুখে।

সদয় হোক ভারতী, সত্য হোক সারথি,
সহো সকল সন্তাপ হাসিমুখে,—থাকো সুখে।

নিন্দা, দ্বেষ, স্বার্থ, প্রেমেতে করো ব্যর্থ,
ক্ষমাতে করো বন্ধু, সব বিমুখে,—থাকো সুখে।

হোক সফল প্রীতি-বন্ধন,   সফল হাসি-ক্রন্দন,
আনো জীবন-অঞ্জলি তাঁর সম্মুখে,—থাকো সুখে।

১৫৬

বেহাগ

এসো হে এসো হে ভারত-ভূষণ, মোদের প্রবাস-ভবনে ;
আমরা বাঙালি মিলিয়াছি আজ পূজিতে বঙ্গ-রতনে।

লহো আমাদের হরষ-ভার ;
পরো আমাদের প্রীতির হার ;
হৃদয়ের থালা ভরিয়া এনেছি
ভক্তিপুষ্প-চন্দনে।

তোমার গৌরব, তোমার মান,
তোমার সুকৃতি, তোমার জ্ঞান,
তোমার বিনয়, প্রেম মহান
ঘোষিছে ভারত-বন্দনে।

ঈশপদে করি মিনতি আজ,
করো-করো তুমি দেশের কাজ ;
দেশের দৈন্য দেশের লাজ
ঘুচাও দীর্ঘ-জীবনে।

১৫৭

নটমল্লার

জয়তু, জয়তু, জয়তু কবি,
জয়তু পুরব-উজল রবি।

জয় জগত-বিজয়ী কবি,
জয় ভারত-গৌরব রবি,
বঙ্গ মাতার দুলাল 'রবি',
জয় হে কবি।

হে কবি, তোমার মোহন তান,
নিখিল-জনের মোহিছে প্রাণ,
নানা ভাষা লভি তোমার দান,
আজি গরবী,
হে বিশ্বকবি।

কভু বাজাও ভেরি গভীর সুর,
কভু বাজাও বীণা মৃদু-মধুর,
কভু বাজাও বেণু প্রেম-বিধুর,
বিচিত্র কবি।

স্বদেশের শঙ্খ যবে বাজাও,
সুপ্ত দেশবাসী-জনে জাগাও,
নবীন উৎসাহে সবে মাতাও,
হে বীর কবি,
দেশ-প্রেমী কবি!

বিশ্বের উদার সমতলে,
ভারতীর দেউল তুলিলে,
দেশ কালের ভেদ ভুলিলে,
কী নব-ছবি!—
হে কর্মী কবি!

বিশ্বেশ্বরের চরণ-তলে
তব গীত-গঙ্গা সুধা ঢালে,
দুঃখী-তাপিত-জনে শীতলে,
হে দেব-কবি!

১৫৮

তিলক কামোদ

মিলন-সভা মাতাও আনন্দ-গানে ;
বাঁধো আজি প্রেম-ডোর প্রাণে-প্রাণে।

শোভন শুভ-উৎসবে,
বৈরী আজি বন্ধু হবে ;
চাহে চিত সর্বহিত-সুখ-পানে।

সকলে ধরি হাতে-হাতে,
চলো হে আগে, চলো হে সাথে,
গাহো শত কণ্ঠ মিলি একতানে।

কাতরে যাচে বন্ধুজনে,
যুবকজন-সম্মিলনে ;
ওহে ঈশ, আশিস করুণা-দানে।

১৫৯

খাম্বাজ

প্রেমময়ে রাখিয়ো সদাই দোঁহে স্মরণে।
যে নব-পথে যাত্রা করিলে আজি,
সবার আশিস লয়ে চলিয়ো নির্ভয় মনে।

সংসারের পথে হাঁটা, কত ফুল, কত কাঁটা ;
সকলই তাঁহারই দান ভুলোনা কভু দু-জনে ;

জীবনের সুখে-দুখে, থেকো সদা হাসিমুখে ;
সাধিয়ো আপন হিত সবার হিত-সাধনে।

মিলনে লভিয়ো শক্তি, প্রেমেতে লভিয়ো মুক্তি ;
পূজার কুসুম হয়ে রহিয়ো তাঁর চরণে।

১৬০

ভৈরবী

মা, তোর শীতল কোলে তুলে নে আমায়,
তোর মেঘে-ঢাকা পাখি-ডাকা শ্যামল শাখায়।

হেথা তোর বিজন বনে, হাসে ফুল আপন মনে,
কেউ তারে দেয় না ব্যথা বিচ্ছেদ ব্যথায় ;
হেথা নাই খাঁচার বাধা নাই পরের বচন সাধা,
হেথা গান গাহে পাখি সুখের হেলায়।

পাষাণের বক্ষ-ঝরা সরসী স্নেহ-ভরা
কূলেতে ফুলের বিথান বিটপীর ছায় ;

হেথা তোর বনের গাওয়া, রঙিন ওই পাখির নাওয়া,
হেথা তোর মৃদুল হাওয়া, মোর সকল ভুলায়।

সুন্দরের কুঞ্জবনে নীরব বেণু-গুঞ্জনে
কে যেন ডাকে আমায়—আয়, আয়, আয়!
তারি সনে থাকব হেথা, ঘুচাব মোর সকল ব্যথা,
চুপি-চুপি কতই কথা কব দু-জনায়!

১৬১

ভৈরব (গ্রীষ্ম)

আদি-রাগ ভৈরব নিদাঘ-উষাগমে,
বিমল মনে গাহো জগবাসী।

গগন-ভালে চন্দন, গহনে পিক-বন্দন,
পুষ্পে নব সৌরভ, মধুপ-পিয়াসী!

বিশ্ব হেনকালে ডাকে বিশ্বনাথে ;
তাঁহার মহিমা গাহো প্রভাতে ;

তাপিত চিত্ত হবে শান্ত তিরপিত,
মুক্ত হবে ভব -নিগড়, মুক্তি-অভিলাষী!

১৬২

কীর্তন

ওহে পুরজন, দাও কিছু ধন
প্লাবন-পীড়িত জনে,
তব দেশবাসী করে হাহাকার
অন্ন-গেহ-বিহনে।

শিল্পী ও চাষি কত গেছে ভাসি
দারুণ এ শ্রাবণে,
আশ্রয় হীন বস্ত্র-বিহীন
মৃত্যু মাগিছে মনে।
(আর সইতে নারে) (বলে হা বিধাতা)

কাঁদিছে জননী, কোলের বাছনি
যায় বুঝি অনশনে।
কে আছ মা, ঘরে, দাও স্নেহভরে
বাঁচাও শিশুরে প্রাণে।
(ওগো স্নেহময়ী) (ওগো শিশুর মাতা)

তব ভাই-বোনে হরিবে শমনে,
সহিবে বলো কেমনে!
দাও কিছু দাও, বিপন্নে বাঁচাও
সুখী করো নারায়ণে।
(ওহে পুরবাসী) (করো দুঃখীর সেবা)

১৬৩

মেঘ (বর্ষা)

প্রবল ঘন মেঘ আজি
নীল ঘন ব্যোম 'পরে ;
আঁধার ঘন-ঘোর
ভানু-চন্দ্র ছায়ি হে।

বরষিছে মুষলধার,
নাহি বিরাম আর ;
বিশ্বশক্তি রাখো এ
বিপদে বাঁচাই হে।

ত্রস্ত ধরণী 'পরে
সকলি হে শঙ্কা করে—
পশু-পক্ষী. জল-স্থল,
নদী-নদ, বায় ;

সকলি বিস্মিত হায়,
ঘনঘোর বরষায় ;
জগপতি, চরণে রাখো
শান্তি বিছায়ি হে।

১৬৪

পিলু (সাওয়ন্)

শ্রাবণ-ঝুলাতে, বাদল-বাতে
(তোরা) আয় গো, কে ঝুলিবি আয়।

প্রেম-গীত ছন্দে দুলিবি আনন্দে
ভুলিবি ভয়-ভাবনায়।

গগন হিল্লোলে কালো মেঘ দোলে
ঝুম-ঝুম নূপুর পায়।

শ্যাম-পত্র-কোলে কুসুম দোলে
রাধা-সনে যেন শ্যাম রায়।

ওগো সুখী-দুখী, দাঁড়া মুখোমুখি
দুলিবি জীবন-দোলায়।

১৬৫

পঞ্চম (শরৎ)

গায় পঞ্চম রাগ মুক্ত গগন, মুগ্ধ ভুবন,
সবে শারদ-সংগীত গাহে ;
প্রভাত নিরমল, পুষ্পিত পরিমল,
নিশীথিনী উজল নয়নে চাহে!

১৬৬

নটনারায়ণ (হেমন্ত)

উজ্জ্বল সমর-বেশে এসো, নটনারায়ণ!
হেরি তোমার মুরতি, বিপদ-দুঃখ-বারণ।

এসো সমর-সাজে, এ ভুবন-মাঝে,
শকতি দেহো দেহে, অন্তরে অভয় আনো।

হেম-কান্তি ধরি এসো হেমন্তের কালে,
বাজুক ডমরু-ভেরি উদ্দাম তালে ;

তুরঙ্গ-বাহন 'পরে, ভরি তূণ খর-শরে,
ভুবনবিজয়ী এসো, এসো দানব-ত্রাসন।

১৬৭

শ্রী (শীত)

আইল শীত-ঋতু হেমন্তের পরে,
শীতল ধরণী এবে চাহে দিবাকরে।

কুন্দ-শেফালিকা ফুলে
নীহারবিন্দু উছলে ;
কুসুম-কানন-মূলে,
শ্রীরাগ বিহার করে ;

রাগিণী নবরঙ্গিনী,
শ্রীরাগ-অনুসঙ্গিনী,
নাচিতে লাস-ভঙ্গিনী,
গাহিছে মোহন স্বরে।

১৬৮

বসন্ত (বসন্ত)

নব-রূপ হেরি আজি বিশ্ব বিমোহিত,
তরু নব-পত্র ফুলে-পুষ্পে বিশোভিত।

কুহরিছে পিককুল, মুকুলে নীপ আকুল,
নন্দিত জীবকুল হরষেতে ব্যাকুল।

সুরভি-অনিলে আজ মৃদুল পরশ,
হেরো বসন্ত পীত-বসন-পরিহিত।

১৬৯

গুজরাটী খাম্বাজ

আজি হরষ সরসী কী জোয়ারা!
প্রাণমে ন মিলত কূল-কিনারা!

গাও, গাও সখী, গৌরব-গীত,
লীলা-চপল রাগ ললিত-ললিত,
কোকিল পঞ্চম করুণ কানাড়া,
গাও, গাও মৃদু-মধুর মল্লারা।

দোলত দিবাকর দিবসমোহন ;
কোকিল কূজত কুহু-কুহু-কুহু ;
চাঁদিয়া-রঞ্জিত রজত-রজনী ;
দূরে চমকত পুলকিত তারা।

১৭০

মিশ্র কালাংড়া

আয়, আয়, আমার সাথে ভাসবি কে আয়!
আজ আমার জোড় লেগেছে ভাঙা ভেলায়!

ওই দেখ্ চাঁদের আলো, ওই শোন্ কল-কল ;
কেমনে থাকবি বল্ শুকনো ডেঙায়?
আয় তোরা কুল-কুলানো কূল-ভুলানো এই দরিয়ায়।

নায়ে মোর নাই কিছু নাই, (তাই) সবার লাগি হবে রে ঠাঁই!
ভুলেছি কূলের বালাই, ভেসেছি তাই।
কে তোরা বাঁধা বাটে, কে তোরা বাঁধা ঘাটে,
সুখেতে থাকিস যদি থাক্ তোরা ভাই ;
যার আঁখি ছল-ছল, আয় রে এ নায়!

ওই দেখ্ সুরধনী, ছোটে কার ডাকটি শুনি ;
আমিও ডাক শুনেছি—আয়, আয়, আয়।
চল্ আজ স্রোতের সনে, ছুটি সেই ডাকের পানে,
যেখানে জীবন-মরণ সব ভেসে যায়!
যেখানে যাবে জানা সেই অজানায়।

১৭১

মিশ্র খাম্বাজ

রুমক-ঝুমক রুম-ঝুম নূপুর বাজে,
বিরহী পরান মম সে দুটি চরণ যাচে।

সে নৃত্যের তালে-তালে দোলে রে কুসুম ডালে,
তড়াগে মরাল দোলে হিল্লোলে তটিনী নাচে।

শিশুর চরণ টলে সে চরণ-ছন্দে,
শিখীর চরণ টলে রঙিন আনন্দে,—
বাদলের রিনি-রিনি বাজে সেই শিঞ্জিনী
শুনি সে চরণধ্বনি নিশীথে-প্রভাতে-সাঁঝে।

মৃদুল মঞ্জুল কভু বাজে সে মধুর,
বেদন-মুখর কভু খর সে নূপুর,—
তরুণ হৃদয়-মাঝে তারি আগমনী বাজে,
নাচে সেই নটরাজে আমার হৃদয়-মাঝে।

১৭২

খাম্বাজ

আনন্দে রুমক-ঝুমু বাজে,
বাজে গো বাজে।
সুন্দর সাজে,
চিত্ত 'পরে নৃত্য করে সে নৃত্যরাজে।

কুঞ্জবন মুঞ্জরিল,
পুলকে অলি গুঞ্জরিল,
নীপ-মূলে দুলে-দুলে শিখীকুল নাচে।

কাজল মেঘে বিজলি-সম,
জীবনে মম সে অনুপম ;
বংশী তার বাজে মনোমাঝে।
লক্ষ্যহীন লক্ষ আশা বক্ষেতে বিরাজে।

১৭৩

খাম্বাজ

বাজে-বাজে গো বাঁশরি নিকুঞ্জ-কাননে।
অন্তর সম্বরি রাখি কেমনে?

নাচে সে মুরলী শুনি
সুরধনী,
আকুল পিককুল গাহে সুতানে।

বহে মন্দাকিনী প্রাণে
বেণু-তানে,
কেন যে টানে গানে, জানে সে জানে।

১৭৪

গৌড় মল্লার

ডাকে কোয়েলা বারে-বারে,
'হা মোর কান্ত, কোথা তুমি হা রে'
চিত্ত-পিক চিত-নাথে ফুকারে।

বাজিছে বংশী মন-বন-মাঝে,
এমন সময়ে সে কোথা বিরাজে?
পুষ্পে পরিমল ফুল-বঁধু যাচে
এসো বঁধুয়া নিকুঞ্জ দুয়ারে।

১৭৫

কাফি

মধুকালে এল হোলি—মধুর হোলি!
রঙের খেলা, রঙের মেলা যেথা দেখি আঁখি মেলি।

বসন্ত-সনে বিবিধ বরনে,
বনে-বনে আজি হোলি!
বিহগ-পতঙ্গ রাঙি নিজ অঙ্গ,
রঙে করে হোলি-কেলি!

ফাগ-থালা হাতে ফাল্গুন-প্রভাতে,
খেলে ভানু ফাগ-খেলা!
ছাড়ি রঙের ঝাড়ি, রঙি সাঁঝের শাড়ি,
পালাল কিরণ-মালী!

গ্রহতারাগণে, হানে গগনে,
কিরণের পিচকারি ;
দেখো, দোলের শশী, পীতে রঙিল নিশি,
উজল জোছনা ঢালি।

দোলে নানা ছন্দে, রঙিন আনন্দে
নন্দদুলালের দোলা।
নরনারীকুল, রঙেতে আকুল—
পথে-ঘাটে আজি হোলি।

১৭৬

হোলি

এসো দু-জনে খেলি হোলি, হে মোর কালো।

এসেছি আঁধারে
খুঁজিতে তোমারে
নিবায়ে ঘরের আলো।
মোহন-মুরলী তব,
হে মম মাধব,
শুনো, আঁধারে বাজে ভালো।

সব নিলে কাড়ি
নিঠুর বিহারী!
কাটিয়ে শরম-জাল ;
লাজ পরিহরি
এসেছি হে হরি,
আজি আবিরে ভরি থাল।

হে মোর নিয়তি,
শ্যাম-মুরতি,
খেলো, নিঠুর খেলা খেলো ;

আজি প্রেম-তীরে,
হৃদয়-রুধিরে
এসো, তোমারে করি লাল।

১৭৭

কীর্তন

আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর,
ওগো অনেক দিনের পর।
আজ আমার সোনার বঁধু এল আপন ঘর,
ওগো অনেক দিনের পর।

আজ আমার নাই কিছু কালো,
পেয়ে আজ উজল মণি সব হল আলো ;
আজ আমার নাইকো কেহ পর,
সুখীরে করেছি সখা, দুঃখীরে দোসর,
অনেক দিনের পর।

মনে পড়িল তা কি?
এতদিন যে দুয়ার খুলে ছিনু একাকী।
বুঝি ভিজিল আঁখি।
আর ছেড়ে যেয়ো না বঁধু জন্ম-জন্মান্তর,
'ওগো আমার সুন্দর।

১৭৮

বেহাগ

এবার আসিলে তুমি সুন্দর বেশে,
পরান কাঁপিছে তাই ত্রাসে হরষে।

এলে না কাজল ঝড়ে,
অশনি-বাহন 'পরে,
আসিলে কুসুম-রথে মধুর হেসে,
—সুন্দর বেশে।

পরিলে কি ছদ্ম-সাজ?
কুসুমে লুকালে বাজ?
হাসিতে কি নাহি বাঁশি, কাঁদাতে কি এলে হেসে?

মনেতে ভাবি আবার
তূণে শর নাহি আর ;
মুছাতে আঁখি-আসার এলে তাই অবশেষে,
—সুন্দর বেশে।

১৭৯
কীর্তন

সবাই কত নূতন কথা কয়,
আমার পুরানো কথা এখনো তো বলা হল না!
সবাই করে নূতন পরিচয়,
আমার আপনজনে এখনো তো জানা হল না!

সবাই ঘোরে দেশ-বিদেশে, নূতন তল্লাসে ;
আমি আছি ঘরে বসে,—
আমার পুরানো বঁধু এখনো তো ঘরে এল না!

সবাই কুড়ায় নূতন কড়ি,
আমি হারাধনের গর্ব করি ;
আমার পুরানো দিনের পুরানো কথা এখনো তো পুরানো হল না!

সবার গরব সিংহাসনে,
আমার গরব তপোবনে ;
আমার সেই শান্তি-মাখা পুরাতনের কোথায় তুলনা!

সবাই কহে, নূতন সুরে গাও,
নূতন প্রেমের নূতন গান শুনাও ;
আমি যে গো করতে নারি আর মনের সাথে গানের ছলনা!

গাঁথব কি আর নূতন গাথা ;
পরানে যে পুরানো ব্যথা!
আমার নিত্য-নূতন, সেই পুরাতন, এখনো তো আপন হল না!

১৮০

ভৈরবী

এ বনেতে বনমালী, কোথা তব বনফুল?
কার লাগি ধায় এত দলে-দলে অলিকুল?

সুরভি-পবন মোরে ঘুরাইছে মিছে ঘোরে,
শুধু কি ফুটাও কাঁটা, ফুটাও না কি মুকুল?

গহনে বিহগ হেন আমারে ভুলায় কেন?
এত গন্ধ এত গান সকলি কি মহাভুল?

বড়ো সাধ ছিল মনে ভরিব আঁচল বনে
ভুলিব চরণে ব্যথা, নয়নে বেদন-দুল!

১৮১

কালাংড়া

বলে দে, ওরে নিঠুর মনের মালী!
কেন তুই কাঁটা-বনে ফুল ফোটালি?

এ ফুলে হয় না মালা,
শুধু তায় ভরে ডালা ;
মিছে তুই কাঁটার ঘায়ে হাত রাঙালি!
মিছে তুই বঁধুর আশে দিন খোয়ালি!

ভবের এ ফুলের মেলায়,
গেল দিন অবহেলায় ;
মিছে তুই প্রেমের পাতে ফুল কুড়ালি।

লয়ে তোর ভরা সাজি,
ফিরে যা ঘরে আজি,
কেন তুই এমন ভুলে মন ভুলালি?
ডালি আজ কাহার পায়ে করবি খালি?

১৮২

মিশ্র কানাড়া

এ আঁধারে কেন আসে, কেন হাসে, কেন মিশে যায় বিজলি?
জনমের সুখ, জনমের দুঃখ—মরুমায়া কি গো সকলি?

হেথা যত চাই ততো পাই না ;
যত পাই ততো চাহি না ;
যত জানি ততো জানি না ;
অন্ধ নয়ন,—তবু দেখিবার আকুল পিয়াসা কেবলই।

যাহারে বলি মোরা ভালোবাসা,
—আপন পূজা, নিজ সুখের আশা।
প্রাণের শোণিতে পালন করি, হায়,
দু-দিনে আশাগুলি কোথা যে উড়ে যায়,
নীরব সাগরে, নীরব শৈল-শিরে
প্রাণ-পাখি কাঁদে,—কোথায় গেলি?

১৮৩

পিলু বারোয়া

হৃদে জাগে শুধু বিষাদ-রাগিণী!
কেমনে গাহিব হরষ-গান?
—আমায় বোলো না, বোলো না গাহিতে গান!

সংসারের মহোৎসবে কভু এই ক্ষীণ কণ্ঠ
আপন উল্লাসে গাহিত গান ;
এবে নয়নে অশ্রু, লয়ে হাসির ভান
কেমনে গাহিব হরষ-গান?
—আমায় বোলো না, বোলো না গাহিতে গান।

১৮৪

আশাবরী

তুমি কবে আসিবে মোর আঙিনায়?
কত বেলি, কত চামেলি, যায় বৃথা যায়!

প্রেম-নীরে ভরি আশার কলসি,
কত-না যতনে সেচিনু তায়!

ফুলদল আসি কহে পরিহাস,
কোথায়, তব বঁধু কোথায়?

নিজ ফুল-সাজে আজি মরি লাজে ;
এ ফুলদায় হতে বাঁচাও আমায়!

নিবে ফুলগুলি নিজ হাতে তুলি
গাঁথিনি মালিকা, যদি শুকায়!

১৮৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ

কে যেন আমারে বারে-বারে চায় ;
আমি তো চিনিনি তারে, সে চেনে আমায়।

যবে থাকি ঘুম-ঘোরে
কে দোরে আঘাত করে ;
কে তুমি বলে ডাকিলে,
কে যেন পালায়!

কুসুমের গন্ধে-রূপে
সে আসে গো চুপে-চুপে ;
মেঘের আড়াল হতে
ডাকে, আয়, আয়, আয়!

কত প্রেমে কত গানে,
সে যেন আমারে টানে ;
চলেছি বিরহী তাই—
কে জানে কোথায়!

হে মোর অচেনা বঁধু,
লুকায়ে থেকো না শুধু ;
এসো, করি পরিচয়
মালায়-মালায়!

১৮৬

বেহাগ

বঁধুয়া, নিঁদ নাহি আঁখি-পাতে!
আমিও একাকী, তুমিও একাকী, আজি এ বাদল-রাতে।

ডাকিছে দাদুরি মিলন-তিয়াসে,
ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে ;
পল্লীর বধূ বিরহী বঁধুরে,
মধুর মিলনে সম্ভাষে ;
আমারো যে সাধ বরষার রাত কাটাই নাথের সাথে!
—নিঁদ নাহি আঁখি-পাতে!

গগনে বাদল, নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়া ;
এসো হে আমার বাদলের বঁধু, চাতকিনী আছে চাহিয়া!

কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া,
সজনী তোমার জাগিয়া!
কোন্ অভিমানে, হে নিঠুর নাথ,
এখনো আমারে ত্যাগিয়া?

এ জীবন-ভার হয়েছে অবহ, সঁপিব তোমার হাতে!
—নিঁদ নাহি আঁখি-পাতে।

১৮৭

কানাড়া

এসো হে, এসো হে প্রাণে, প্রাণসখা!
আঁখি তৃষিত অতি, আঁখি-রঞ্জন,
আঁখি ভরিয়া মোরে দেহো দেখা।

খুলিয়া প্রাণের আধো লাজ-বসন
জীবন-মন্দিরে পেতেছি আসন ;
বোসো হে বিরহ-ক্লেশ-নাশন,
কণ্ঠে লহো মম মালিকা।

উন্মাদ এ তরঙ্গ ;
উথলিছে ভীষণ ভঙ্গ!
ঘোর তিমির ঘেরি দশ দিক ;
এসো হে নবীন নাবিক!
জীবন-তরী-মাঝে নাহিকো কাণ্ডারি ;
প্রেম-পারাবারে আমি একা!

১৮৮

বেহাগ

এত হাসি আছে জগতে তোমার,—বঞ্চিলে শুধু মোরে!
বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

হাসিব, হাসাব—এই মনে লয়ে রচিলাম কত গান ;
সেই গানে আমি কাঁদিলাম কত, কাঁদালেম কত প্রাণ ;
যে ডোরে সবার হয় মালা গাঁথা,—দিলি ফাঁসি সেই ডোরে!
বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

আমিও তো কত সুখের আশায় আশার ভেলায় ভেসেছি ;
আমিও তো কত সেই বাঁশি শুনি যমুনার কূলে এসেছি ;
কোথা শ্যাম রায়, যার লাগি হায়, রহিতে নারিনু ঘরে?
বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

বুঝেছি তোমার মধুর মুরলী বাজিবে না মোর তরে ;
এসো, ঘনশ্যাম, তোমার রুদ্র দণ্ড লইয়া করে ;
লয়ে যাও মোরে, হে চিরবিরাম, তোমার রথের 'পরে!
বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

১৮৯

খাম্বাজ

কেন যে গাহিতে বলে, জানে না, জানে না তারা!
যে সুরে গাহিতে চাহি আমি যে সে সুর-হারা!

যে সুরে শিশুরা হাসে, যে সুরে ফুল বিকাশে,
যে সুরে প্রভাতে পাখি বরষে অমৃত-ধারা!

যে সুরে নাচে পতঙ্গ, যে সুরে নাচে তরঙ্গ,
যে সুরে নাচে গগনে, ঘুরে-ঘুরে শশী-তারা!

সংসারের পোষা পাখি, জীবন-পিঞ্জরে থাকি,
শিখেছি শেখানো কথা, তাই গেয়ে হই সারা।

যে কাননে মোর বাসা ভুলে গেছি তার ভাষা,
শেখা কাঁদা, শেখা হাসা, জানিনে গো তাহা ছাড়া!

১৯০

মিশ্র পরজ ভৈঁরো

বিধি! আর তো তোমারে নাহি ডরি।
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।

যবে কণ্টক তরু তলে ভাসাবে নয়ন-জলে,
আমি কুসুমে দিব গো তারে ভরি।

হানো যদি খর-বাণ, আমারও তো আছে গান
আমি সম্মুখে রহিব তারে ধরি।

জেনো ওহে নিরদয় হবে তব পরাজয় ;
সন্ধি করিবে এসো অরি!

যারে ব্যথা দিবে তুমি তাহার নয়ন চুমি
যতনে বেদন লব হরি ;

সবারে রাখিব বুকে (মোরে) কেমনে রাখিবে দুখে?
সবাকার হাসি যে গো মোরই!

১৯১

মিশ্র আশাবরী

আমার আঙিনায় আজি পাখি গাহিল এ কী গান?
শুনিনি এমন গাওয়া—হেন মরমভেদী বাণ!

যে করেছে অবহেলা, আমার গানের মালা,
আজি কি পাখির গলায় তার গলার প্রতিদান?

যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় এ তারি কথা ;
বুঝি গো ভিজেছে আজি তার নিঠুর দু-নয়ান!

বল্ রে অজানা পাখি, তুই তার দূত নাকি?
এতদিনে ভাঙিল কি তার গভীর অভিমান?

মোর প্রাণের গানটি শিখি বনে যা তুই বনের পাখি ;
বুঝায়ে কহিস তাহারে, আমি তার লাগিয়া ধরি প্রাণ।

১৯২

মিশ্র আশাবরী

ওগো দুঃখ-সুখের সাথী, সঙ্গী দিন-রাতি, সংগীত মোর!
তুমি ভব-মরু-প্রান্তর-মাঝে শীতল শান্তির লোর!

বন্ধুহীনের তুমি বন্ধু,
তাপিত-জনের সুধা-সিন্ধু,
বিরহ-আঁধারে তুমি ইন্দু,
নির্জন-জন-চিত-চোর!

দীন-হীন পথচারী,
সম্বল হে তুমি তারি ;
সম্পদে-উৎসবে জন-মনোহারী,
সর্বতরে প্রেম-ক্রোড়!

তব পরশ যবে লাগে,
সুপ্ত স্মৃতি কত জাগে ;
বিস্মৃত কত অনুরাগে,
রাঙে হৃদয় ঘন-ঘোর!

যাহা বাক্য কহিতে নাহি জানে,
অন্তরে কহ তাই তানে ;
মুক্ত কর তুমি, ছিন্ন কর গানে,
বন্ধন কঠিন-কঠোর!

গীতি-মুখর তরু-ডালে
তব দূত অমৃত ঢালে ;
পুষ্প দোলে তব তালে,
অম্বরে নাচে চকোর।

ভক্ত-কণ্ঠে তুমি ভক্তি,
বীর-করে নব-শক্তি ;
সুর-নর-কিন্নর, বিশ্ব-চরাচর,
তব মোহ-মন্ত্র-বিভোর।

১৯৩
গজল

কত গান তো হল গাওয়া,
আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে
তবে কেন মিছে চাওয়াও ?

যদি যতই মরি ঘুরে
তুমি ততোই রবে দূরে,
তবে কেন বাঁশির সুরে
তব তরে শুধু ধাওয়াও ?

যদি সন্ধ্যা হলে বেলা
নাহি মিলে তব বেলা,
পথ-ভোলা মোর ভেলা,
এ অকূলে কেন বাওয়াও ?

যদি আমার দিবা-রাতি
কাটি যাবে বিনা-সাথী,
তবে কেন বঁধুর লাগি
পথ-পানে শুধু চাওয়াও ?

বড়ো ব্যথা তোমায় চাওয়া
আরো ব্যথা ভুলে যাওয়া ;
যদি ব্যথী না আসিবে,
এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?

১৯৪

মিশ্র খাম্বাজ

দিল-দরিয়ায় বান ডেকেছে, সামাল রে তোর গানের তরী।
ছুটবে সে আজ অজানা দেশে, টুটবে রে সব বাঁধন-দড়ি।

হালটি ধরে থাকিস হাতে, সাথীরে তুই রাখিস সাথে,
ফেলে দে সকল পুঁজি, নইলে ভেলা হবে ভারী।

কোথায় যাবি এই উজানে, কেউ না জানে, নাই-বা জানে
যে তোরে টানল বানে, সেই যে রে তোর প্রেমের হরি।

ভয়ে যবে ভাঙবে পরান, কণ্ঠে যেন থাকে রে গান
ঝড়ের হাওয়া লাগলে পালে, আরও বেগে যাবি তরি।

১৯৫
বাউল

প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্ ;
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া, এমন গাঙের জল!

যখন ছিলি এতটুকু,
সেথাই পেলি মায়ের সুধা ঘুম-পাড়ানো বুক ;
সেথাই পেলি সাথীর সনে বাল্যখেলার সুখ ;
যৌবনেতে ফুটল সেথাই হৃদয়-শতদল।
—প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্।

হরির লুটের বাতাসা, আর পৌষ মাসের পিঠা,
পীরের সিন্নি, গাজির গান, আর করিমভাইয়ের ভিটা,
আহা মরি সেই স্মৃতি আজ লাগছে কত মিঠা!
শিউলি-বেলি কদম-চাঁপা এমন কোথায় বল্।
—প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্।

মনে পড়ে দেশের মাঠে খেত-ভরা সব ধান
মনে পড়ে তরুণ চাষির করুণ বাঁশির তান,
মনে পড়ে পুকুর-পাড়ে বকুল গাছের গান
মনে পড়ে আকাশ-ভরা মেঘ ও পাখির দল।
—প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্।

১৯৬
পূরবী

ছিলে এ মরতে ওগো দয়াময়ী,
দুঃখিনীর মাতা হয়ে ;
বাঁধ নাই ঘর দু-জনার তরে,
আছিলে সবারে লয়ে।

কত অনাথিনী কত অভাগিনী
তোমার প্রেমের দানের ভাগিনী,
কত আঁখি-নীর মুছায়েছ তুমি
স্নেহের অঞ্চল দিয়ে।

ওগো মহাপ্রাণ, তোমার প্রয়াণ
স্বর্গ করেছে আজি গরীয়ান,
তব পুণ্যস্মৃতি রবে এই লোকে
অমর-অক্ষয় হয়ে।

১৯৭

বসন্ত-বাহার

গাহো রবীন্দ্র-জয়ন্তী-বন্দন,
ভকত-জনে আনো পুষ্প-চন্দন।
বরো বরেণ্যে, জগত-মান্যে,
মুখর যাঁর গানে কাব্য-কানন।

সাহিত্য-আকাশে ভাতে যত রবি,
ইন্দ্র সবাকার, তুমি ওহে কবি,
গৌড় গৌরবে তোমার সৌরভে,
বিশ্ব বিমোহিত, মুগ্ধ গুণীজন।

হে অমর কবি, থাকো মরলোকে
বর্ষ বহু আরো মোদের সম্মুখে ;
বঙ্গবীণা আরো বাজাও গুণী,
মহান্-মোহন বাণী কহো শুনি।

রচো এ ভুবনে 'শান্তিনিকেতন'।
পূর্ণ হউক তব পুণ্য-সাধন।

১৯৮

কাফি-সিন্ধু

কেন তারে পাইনে দেখা নয়নে?
লুকিয়ে সে বসে আছে জীবনে কোন্ গোপনে।

যখন থাকি আপন মনে,
কয় সে কথা ক্ষণে-ক্ষণে ;
তার সকল ভাষা বুঝতে নারি,
কী ভাষা তার কে জানে?

ভাসিয়ে আমার গানের তরী
তারে ঘাটে-ঘাটে খুঁজে মরি ;
ভাবে সবাই ঘর ছেড়েছে
আমারি সন্ধানে।

নয়নে যে ধরে কায়া,
বুঝেছি সব তারি ছায়া!
নয়নে যে দিল না ধরা
দিবে কি সে পরানে—কে জানে।

১৯৯

বাউল

কে তুমি ঘুম ভাঙায়ে, কেন মোরে,
ডাকিলে গো এ আঁধারে?
স্বপ্নে যারে চেয়েছিনু
সে বুঝি চাহে আমারে।

কেন তবে দাও না ধরা?
কেন খোঁজাও সারা ধরা?
কেন বাজাও মন-হরা
ও মুরলী বারে-বারে?

মরু-আঁধার ছিল ভালো,
কুঞ্জ-আঁধার আরো কালো।
কে তুমি গো রাত-ভুলানো,

সন্ধ্যাবেলায় প্রভাত-আলো?
ঘুম-ভাঙানো রাত-জাগানো
কে জানে সে অজানারে!

২০০

দেশ

মন-পথে এল বনহরিণী ;
এ কী মনোহারিণী?
তার সজল-কাজল আঁখি
কেন তাহা নাহি জানি।

পথের বাঁশরি শুনি কি পথহারা?
থাকি-থাকি তাই চকিত দুটি তারা—
কারে চাহ তুমি বন-বিহারিণী?

থমকি থির এ কী বঙ্কিম ভঙ্গি?
আছে কি এ প্রাঙ্গণে তব প্রেমসঙ্গী?
কোথা যূথ তব, কোথা সে বনস্থলী?
আইলে হেথায়, জেনে কি পথ ভুলি?
বন ছাড়ি কেন মন-বিষাদিনী?

২০১

বেহাগ

তুমি গাও, তুমি গাও গো।
গাহো মম জীবনে বসি, বেদনে বাঁধা জীবন-বীণা
ঝংকারি বাজাও গো।
—তুমি গাও।

তোমার পানে চাহিয়া, চলিব তরী বাহিয়া।
অভয়-গান গাহি ভয়-ভাবনা ভুলাও।
—তুমি গাও।

দগ্ধ যবে চিত্ত হবে এ মরু-সংসারে,
স্নিগ্ধ করো মধুর সুর-ধারে।
তোমার যে সুরে-ছন্দে পাখিরা গাহে আনন্দে,
শিষ্য করি আমারে সে সংগীত শিখাও।
—তুমি গাও।

২০২

ভীমপলশ্রী

যারা তোরে বাসলো ভালো,
যারা দিল প্রাণে ব্যথা,
যাবার আগে বন্ধু জেনে
সবার পায়ে নোওয়া মাথা।

যাদেরে তুই পর ভাবিলি,
যাদের চোখে জল আনিলি,
ক্ষমা চেয়ে সবার পায়ে
জানা রে আজ প্রাণের কথা।

জীবনে যা পাবার ছিল,
সবাই তোরে তাই তো দিল ;
যা পেলি তাঁর চরণধূলি—
আর তবে তোর ভাবনা কোথা?

পাবার বাকি আছে যাহা
পাবি না তুই হয়তো তাহা।
খুলিস না আর খেয়ার ঘাটে
পাওনা-দেনার জমার খাতা।

২০৩

কীর্তন

হরিনাম ভজন করো মন (হরিনাম)।
নাম সংকট-তারণ, ভবভয়-বারণ,
তাপ-কলুষ-বিমোচন (নাম)।
ও নাম গায় দেবগণ, গায় জীবগণ,
গায় তটিনী-গিরি-বন ;
ও নাম শ্রবণ-রঞ্জন, হৃদয়-নন্দন,
সাগর-মন্থন ধন ;
ও নাম গাও মোর বীন, গাও নিশিদিন,
গাও হরি-গুণগান।

২০৪
পিলু-গজল

ওগো ক্রন্দসী পথচারিণী,
তুমি কোথা যাও, তুমি কারে চাও?
কী ব্যথা তব অন্তরে,
ও বিষাদিনী, মোরে বলে যাও।

বন্ধুর পথ অজানা,
বন্ধুর ঘর জানো না,
তুমি পথিকে কত শুধাবে—
'কোথা গেছে সে পথ বলে দাও?'

সংকটময় ভুবনে
চলিবে একা কেমনে?
কোন্ চঞ্চল তাড়নে
বঞ্চিলে নিজ ভবনে?

এসো গো অয়ি অঙ্গনে,
এসো গো এই অঙ্গনে,
দেখ তল্লাসি এই অন্তরে,
তুমি যারে চাও যদি তারে পাও।

২০৫
বাউল

ও জীবন-সুখের পথিক, ভুল পথে আর চলবি কত?
চলিয়ে অবিশ্রান্ত হলি ক্লান্ত, তার দেখা তুই পেলি না তো।

কতবার মোহের বশে, ভাবিলি ওই বুঝি সে,
গেলি তুই ঊর্ধ্বশ্বাসে কাছে হেসে ;
সুখ ভেবে কোল দিলি তারে, লাগল দুঃখের মতো!

পর-সুখ খুঁজবি যবে, নিজ-সুখ পাবি তবে,
ও পথিক, পথ চলা তোর সফল হবে ;
আপনারে হারাবি যত ঘরের পুঁজি বাড়বে ততো।

দুঃখে যে বুক ভাসাবে, সুখেতেই সেই হাসাবে,
তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে চল্ রে পথিক চল্ রে ভবে ;
নয়নে সিঞ্চিলে জীবন অন্তরে ফুল ফুটবে শত!

২০৬

ভূপালি

আসিল শীত ঋতু বায়ু আজি।
বহিছে শীতলিয়া জনমন মোহিয়া।
তিরপিত হও সবে সংগীত-পিপাসু
ভূপালি গাহিয়া।

২০৭

পিলু-খাম্বাজ

কে গো যায় যমুনায় জল আনিতে।
বিজলি করে কেলি তারি নীল সরিতে।
আঁখিতে-আঁখিতে হৃদয়ে রাখিতে
কেলে-সোনা আনাগোনা করে কদমতলাতে।

২০৮

জননী বঙ্গ, তোমার সঙ্গ লভিয়া যদি গো
অঙ্গ আমার হয় না মা, ক্ষয় ;
তথাপি রঙ্গে ভ্রূকুটি-ভঙ্গে তুচ্ছ করিয়া
গাহিব জননী, তোমারি জয়।
লাঞ্ছিত আমরা যদিও জননী,
শোণিত-রঞ্জিত মোদের শির ;
বক্ষ ভেদিয়া বয়ে যায় গুলি,
তথাপি ফেলি না অশ্রু-নীর।
মৃত্যু সতত করিছে নৃত্য শিয়রে মোদের,
তবু তো করি না কাহারে ভয়।

অভয়ার বরপুত্র আমরা
হাসিয়া করি মা, গরল পান ;
অনল-দাহন যদিও মা বুকে,
কণ্ঠ গাহিছে তোমারি গান।
সপ্ত কোটি সন্তান আমরা
তোমার লাগিয়া এনেছি অর্ঘ্য ;
তুমি গো জননী, দেবতা মোদের,
ধরায় তুমি মা, মোদের স্বর্গ!
যে পূজার মা গো, এত আয়োজন প্রাণ-বিনিময়ে
যেন সে যজ্ঞ পূর্ণ হয়!

২০৯

সাধে কি মা তোরে ডাকি।
সাথের সাথী সব গিয়েছে, বিজন পথে একা রাখি।
মা তোরে আমি চাইনি বলে সবাই ফেলে গেছে চলে,
বাঁধব বলে বসে আছি হাত ভরা মোর রইল রাখী।
আনতে সাধের হরিণ ধরে, হারিয়েছি মা যা ছিল ঘরে,
আজ সুখের মায়া সোনার কায়া
খুব আমারে দেছে ফাঁকি।
নয়নে আজ এসেছে জল, খুঁজে পাইনে এখন আঁচল,
চিরদিনের বলে যে আঁচলে, নিঃশেষিয়ে মুছব আঁখি।
তুই বুঝি মা দয়া করে, আমার সকল পুঁজি নিলি হরে,
যদি একে-একে মন নিলি মা,
আমায় কেন রাখলি বাকি।

২১০

এল গো আজ চাঁদ-বদনী স্বর্ণ-উজল সাজে।
ঢেউগুলি তাই নাচে ;
উল্লসিয়া কল্লোলিয়া ঢেউগুলি তাই নাচে।
নীল সাগরের বক্ষে আজি লক্ষ ঘুঙুর বাজে।

সোনার নায়ে সোনা-গায়ে কে এলে গো রানী!
ঘোমটাখানি টানি,
মাঝে-মাঝে নীলাম্বরীর ঘোমটাখানি টানি।
তোমার মনে কি আছে তা জানি ওগো জানি।

ঘরের বাহির করবে মোরে এই তো আছে মনে?
তাই তো সংগোপনে,
হাওয়ার সনে কানা-কানি তাই তো সংগোপনে ;
মেঘের আঁচল পড়ছে খসে তাই তো ক্ষণে-ক্ষণে!

আমি যদি আপন হতেই দিই তোমারে ধরা
মিথ্যে যতন করা।
অমন করে মন ভোলানোর মিথ্যে যতন করা।
তোমার তরেই বসে আছি, ওগো স্বয়ম্বরা।

২১১
প্রত্যাবর্তন

খোল মা খোল মা দ্বার বহুদিন পরে
আজি এ তামসরাতে উল্কার আলোকে
পথ চিনি পুরাতন মাতৃগৃহে পুন
ফিরিয়া এসেছি ; মোরা কোটি পুত্র তোর,
নহি মা অতিথি ; স্নেহে ডেকে নে গো ঘরে।
নাহি সুখশয্যা পর্ণগৃহে তোর?—তাহে
ক্ষতি কি মা? আজি ধর্মদ্বেষ-জাতিগর্ব
ভুলি, কণ্ঠে-কণ্ঠে মিলি সহোদর সবে
তোর ক্রোড়ে সব ব্যথা জুড়াতে এসেছি, ...
মুষ্টিঅন্ন যাহা আছে তাই দেগো আজ
কোটি হস্তে বাটি লব মায়ের প্রসাদ
মিটাইব পূর্ণ করি প্রবল এ ক্ষুধা।
কোটি হস্তে ভরা শস্যে করিব শ্যামল
অচিরে প্রান্তর তোর কোটি পুত্র মিলি।
স্বেচ্ছায় ফেলিয়া দূরে মহার্ঘ বসন
ভিক্ষুকের বেশে মা গো এসেছি আমরা ;
খুলে দে খুলে দে দ্বার, অয়ি স্নেহময়ী।....

ঐ যে খুলিল দ্বার, মার মৌনমুখে
ঈষৎ হাসির রেখা ; হস্ত প্রসারিত
স্নেহে ; দে মা পদধুলি অধম সন্তানে।
আয় ভাই ত্যাগমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত
স্বার্থ করি বলিদান মার পদাম্বুজে,
তুলিয়া বঙ্গের পুষ্প বঙ্গ জননীরে
অর্ঘ্য করি দান ; ঘুচাই দুর্গতি ;
গগন ভরিয়া বলি, 'বন্দে মাতরম্',
'বন্দে মাতরম্'—পুনঃ 'বন্দে মাতরম্'।

২১২
অর্ঘ

এনেছি, হে বিশ্বনাথ, এ সুপ্ত নিশীথে
গুপ্ত অর্ঘ্য মোর ; অন্ধ আঁধারে সঞ্চিত
সুগন্ধ কুসুম, লক্ষ নাগ-সুরক্ষিত
কন্টক-কেতকী—লহ তারে নাগ-নাথ!
একী বিশ্বেশ্বর! কেন বহে অশ্রু-ধার
ত্রিনেত্রে তোমার? পড়েছে কি মনে
শিবশূন্য দক্ষযজ্ঞে সতীর ক্রন্দন,
লাঞ্ছিত প্রেমের সেই চরম আহুতি?
জেগেছে কি পূর্বস্মৃতি, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
তোমার সে প্রণয়ের প্রলয়-নর্তন?
জাগিল কি মনে পার্বতীর প্রেমালাপ
মানস-সরসী-তটে নির্জন কৈলাসে?
লহ তবে, হে বৈরাগি, জাহ্নবীর তীরে
এ দীনের মহাদান পূত নেত্র-নীরে।

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : কবিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেনের পুত্র রামপ্রসাদ তাৎকালিক কেতায় কিছুটা সংস্কৃত ও ফারসি শিখে ফরিদপুরের গ্রামে শিক্ষকতা করতেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী রামপ্রসাদ গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় প্রগতিপন্থী ব্রাহ্ম যুবকদের সংস্পর্শে তিনিও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে সমাজচ্যুত হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় তিনি কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। এই সময়ই কালীনারায়ণ গুপ্ত তাঁর কন্যা হেমন্তশশীর সঙ্গে রামপ্রসাদের বিবাহ দেন। রামপ্রসাদ ও হেমন্তশশীর সন্তান অতুলপ্রসাদ আঠারো-শো একাত্তরে কুড়ি অক্টোবর ঢাকার ভাটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা : প্রথম জীবনে ঘোর শাক্ত কালীনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে সপরিবারে ভৃত্যবর্গসহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মসংগীত-রচয়িতা হিসেবে সুখ্যাত কালীনারায়ণের সংগীত-সংকলন গ্রন্থের নাম 'ভাব-সংগীত'। পিতার অকালবিয়োগের পর অতুলপ্রসাদ মাতামহের গৃহে প্রতিপালিত হন। মাতামহের সান্নিধ্যে তিনিও বাল্যকাল থেকে সংগীতানুরাগী হয়ে ওঠেন।

আঠারোশো-নব্বইতে এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে সেই বছরই তিনি ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য ইংল্যাণ্ডে যান। তাঁর সংগীত রচনার সূত্রপাত তখন থেকেই। যাত্রাপথে ভেনিসে গণ্ডোলার মাঝিদের গানের সুর আহরণ করে তিনি সেই সুরে রচনা করেন "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী" গান।

লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় তিনি ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। এই পরিমণ্ডলে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় (নায়ুডু), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মনোমোহন ঘোষ। তাঁদের নেতা ছিলেন দাদাভাই নওরোজি।

আঠারোশো-চুরানব্বইতে তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করেন।

কর্মজীবন : আঠারোশো-পঁচানব্বইতে অতুলপ্রসাদ কলকাতায় লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জুনিয়র আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সরলা দেবীর মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন ও 'খামখেয়ালি সভা'র সঙ্গে যুক্ত হন। সাহিত্য ও সংগীতে অত্যধিক রুচির জন্যে তিনি কলকাতায় পসার

লাভ করতে পারেননি। কলকাতার বাইরে রংপুরে গিয়েও আইনব্যবসায় তিনি সফল হননি।

উনিশশোতে তিনি বিবাহের জন্যে স্কটল্যাণ্ড যান। বিবাহের পর ইংল্যাণ্ডে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও সফলকাম হননি। উনিশশো-দুইতে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। আত্মীয়-স্বজনদের ব্যবহারের দরুন কলকাতায় থাকা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। অতঃপর বন্ধু মুমতাজ হুসেনের পরামর্শে তিনি লখনউতে যান ও আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত-প্রদেশের অন্যতম সেরা আইনজীবী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। বার-এসোসিয়েশন ও বার-কাউন্সিলের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। সে সময় রাজনীতিতে আইনজীবীদের প্রধান্য ছিল। অতুলপ্রসাদ কংগ্রেসে যোগ দেন ও কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি লখনউ পুরসভার উপ-প্রধানও নির্বাচিত হন। উনিশশো-সতেরো অবধি তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। এরপর তিনি লিবারেল-পার্টিতে যোগ দেন এবং ওই দলের প্রাদেশিক সভাপতি হন। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লখনউ ক্যানিং কলেজকে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার কাজে তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কার্যকরী সমিতির তিনি সদস্য ছিলেন। প্রদেশের যাবতীয় সমাজ-হিতৈষণার উদ্যমে তাঁকে দেখা যেত। ব্রাহ্ম, হিন্দু, মুসলমান, আর্যসমাজ-ইত্যাদি সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের শুভকাজে তিনি আর্থিক সহায়তা করতেন। উনিশশো-তেইশে তিনি বহির্বঙ্গে বাঙালিদের সংগঠন প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন গড়ে তোলেন। ওই সম্মিলনের কাশী ও গোরখপুর অধিবেশনের তিনি মূল সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যমে উনিশশো-পঁচিশ থেকে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় কাশী থেকে 'উত্তরা' মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। উনিশশো-ছাব্বিশে লখনউতে অনুষ্ঠিত সংগীত-সম্মেলনের তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠক। কর্মজীবনে প্রভূত অর্থোপার্জনের সঙ্গে তিনি সংগঠক, সমাজসেবী, কবি ও সংগীতজ্ঞ হিসেবে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-স্বরূপ তাঁর জীবিতকালেই বাড়ির সামনের রাস্তার নাম রাখা হয় এ.পি.সেন রোড।

বিবাহ : বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দের কন্যা হেমকুসুম ও অতুলপ্রসাদ পরস্পরের প্রতি প্রেমানুরক্ত হয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ যখন ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়ছিলেন তখন কৃষ্ণগোবিন্দ সপরিবারে সেখানে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে অতুলপ্রসাদ যখন হেমকুসুমকে বিবাহের সিদ্ধান্ত জানান, তখন উভয় পরিবারই এই নিষিদ্ধ-সম্পর্কের বিবাহপ্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। হেমকুসুমও তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। সিভিল ম্যারেজ আইনে ও ব্রিটিশ ম্যারেজ আইনে এই বিবাহ সম্ভব না-হওয়ায় অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পরামর্শে স্কটল্যাণ্ডে যান ও সেখানকার গ্রেটনাগ্রিন গ্রামের সাবেক রীতিতে উনিশশোতে বিবাহ করেন।

অতুলপ্রসাদ ইংল্যাণ্ডে আইনজীবী হিসেবে থাকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানে আইন ব্যবসায়ে তিনি ব্যর্থ হন। উনিশশো-একে তাঁদের যমজ-পুত্রসন্তান দিলীপকুমার ও নিলীপকুমারের জন্ম হয়। চূড়ান্ত অর্থাভাবের দরুন হেমকুসুম তাঁর গয়না বিক্রি করেন। সাত মাস বয়সে অর্থাভাবের কারণে প্রায় বিনা চিকিৎসায় তাঁদের পুত্র নিলীপকুমার মারা গেলে তাঁরা দেশে ফিরে আসেন।

কলকাতায় আত্মীয়-পরিজন তাঁদের স্বাগত জানাননি। এই প্রতিকূল পরিবেশে বন্ধু মুমতাজ হুসেনের পরামর্শে অতুলপ্রসাদ লখনউতে চলে যান ও অচিরে একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

লখনউতে তাঁদের প্রাথমিক দাম্পত্যজীবন ছিল সুখের ও সচ্ছলতার। অতুলপ্রসাদ গান লিখতেন—গান গাইতেন। হেমকুসুম ছবি আঁকতেন—গান গাইতেন। কিন্তু তাঁদের সেই সুখ ছিল ক্ষণস্থায়ী। তাঁদের দুঃখের ও অভাবের দিনে যাঁরা তাঁদের প্রতি বিমুখ ছিলেন, তাঁরাই সদলবলে অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের সংসারে এসে কর্তৃত্ব করতে থাকেন। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর অতুলপ্রসাদের জননী হেমন্তশশী কন্যাদের নিয়ে অতুলপ্রসাদের গৃহে চলে এলে হেমকুসুমের পক্ষে তাঁর কর্তৃত্ব সহনীয় হয়নি। মাতৃভক্ত অতুলপ্রসাদ সারাদিন নানা ব্যস্ততায় বাইরে থাকতেন। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। হেমকুসুম অন্যত্র বসবাস করতে শুরু করেন। হেমন্তশশীর মৃত্যুর পরেও অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের দাম্পত্যসম্পর্ক আর স্বাভাবিক হয়নি। জীবনীকারেরা হেমকুসুমকে রাগি ও জেদি বলেছেন। কিন্তু তাঁদের দাম্পত্য-সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য কেউ চেষ্টা করেননি। নিজের অসহায়বোধ ও একাকিত্বের বেদনা অতুলপ্রসাদ তাঁর গানের ছত্রে-ছত্রে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। একদিন দিনের শেষে কর্মক্লান্ত অতুলপ্রসাদ বাড়ি ফিরে দেখতে পান যে, স্বামীর নিষ্ক্রিয়তার ও নিজ সংসারে পরবাসের ক্ষোভে হেমকুসুম স্বামীর যাবতীয় পোষাক আগুনে পোড়াচ্ছেন। অতুলপ্রসাদ নিঃশব্দে ফিরে যান ও অন্যত্র রাত্রিবাস করেন। ওই রাতেই তিনি রচনা করেন, "যাব না যাব না যাব না ঘরে/বাহির করেছে পাগল মোরে।" অতুলপ্রসাদ আমৃত্যু হেমকুসুমের প্রতি প্রেমানুরক্ত ছিলেন। অতুলপ্রসাদের প্রতি গভীর অনুরাগে হেমকুসুমও তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে অপরের উপস্থিতি অবাঞ্ছিত মনে করেছিলেন।

কাব্যগ্রন্থ : অতুলপ্রসাদের গীতি-কবিতার গ্রন্থদ্বয় : 'কয়েকটি গান' ও 'গীতিগুঞ্জ'। 'কাকলি' গ্রন্থমালায় তাঁর গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে।

মৃত্যু : শরীরের দিকে না তাকিয়ে অতুলপ্রসাদ উদয়াস্ত পরিশ্রম করতেন। কারণ, তাঁর উপরে নির্ভরশীল মানুষ নেহাত কম ছিলেন না—অথচ তাঁর কষ্টের দিনে কেউ তাঁর কাছে ছিলেন না। উনিশশো-তেত্রিশে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের

জন্যে তিনি হাওয়া বদলাতে ও বিশ্রাম নিতে কার্শিয়াং-এ যান। ডিসেম্বরে গোরখপুরে অসুস্থ অবস্থায় তিনি প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতি হিসেবে বক্তৃতা দিতে আসেন। সেখান থেকে কলকাতা হয়ে তিনি লখনউ ফেরেন। স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে আইন ব্যবসা বন্ধ হলে তিনি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে আট হাজার টাকা ওভারডাফ্‌টে তোলেন। ওই সময় এই টাকার পরিমাণ নেহাৎ কম ছিল না।

উনিশশো চৌত্রিশের পনেরো এপ্রিল পুনরায় স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি পুরীতে যান। পুরী থেকে অগাস্টে ফিরে এসে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছাব্বিশে-অগাস্ট গভীর রাতে তিনি শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর। চৌত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের বত্রিশ বছরই তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ছিল। জীবনীরচয়িতাদের বক্তব্য অনুসারে, স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে তাঁর স্ত্রী বিচলিত হননি।

ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে উনষাট বছর বয়সে উনিশশো ত্রিশের তিন মে অতুলপ্রসাদ উইল করেন। এই উইল অনুসারে তিনি স্ত্রী-পুত্রের জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করেন। পুত্রের জন্য জীবনবিমার কিস্তির ব্যবস্থাও তাতে ছিল। এছাড়া রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমের অধীন হেমন্ত-সেবাসদন, কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ঢাকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ, ফরিদপুরের পঞ্চপল্লী গুরুরাম হাইস্কুল, ব্রাহ্ম প্রচারক, লখনউ বেঙ্গলি ক্লাব ও ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশন, লখনউ বেঙ্গলি গার্লস হাইস্কুল, লখনউয়ের মুমতাজ পার্কের মুসলিম এতিমখানা, লখনউ বা অন্যত্র স্থিত হিন্দু বা আর্যসমাজের অনাথালয় এবং ট্রাস্টিদের বিবেচনাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য মাসোহারার সংস্থান উইলে তিনি রেখেছিলেন। তাঁর গ্রন্থস্বত্ব তিনি কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দিয়ে যান।

মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে ছিল লখনউয়ের চারবাগে বাড়ি, তৎসংলগ্ন জমি, তাঁর যাবতীয় পুস্তক-সংগ্রহ ও আসবাবপত্র, মোটর কার, দশ হাজার টাকার পোস্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট, জীবনবিমা, শেয়ারপত্র, তাঁর বই গান ও ডিসক থেকে পাওয়া রয়্যালটি ইত্যাদি। আনন্দবাজার পত্রিকায় এই দানপত্র মুদ্রিত হয়েছিল।

বর্ণানুক্রমিক প্রথম পংক্তি ও সূচি

প্রথম পংক্তি

প্রথম পংক্তি